কোচবিহার জেলার প্রান্তিক মুসলমান সমাজে জারি গানের ধর্মীয়, লৌকিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত

এম.ফিল(তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গোলজার হোসেন

রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা: 133488 of 2015-16

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা: MPC0194013

ক্রমিক সংখ্যা: 001700203013

শিক্ষাবর্ষ: 2017-19

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

মে ২০১৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কর্মের শুরুতে যে সকল মানুষগুলোর স্নেহ ও উৎসাহ আমার প্রতিটি পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাঁদের মধ্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ঈপ্সিতা হালদার মহাশয়াকে। তার অনুপ্রেরনা ও সাহায্য এবং নির্দেশ না পেলে এই গবেষণা যথাযত সম্ভব হত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। এ বিষয়ে আরও উৎসাহ ও সুচিন্তিত অভিমত দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয়কে।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বইপত্র, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পরামর্শ, উৎসাহ দিয়ে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, প্রিয় দাদা মহম্মদ লতিফ হোসেন, আলী হোসেন, সম্রাট হেমব্রম এবং প্রিয় দিদি আবিদা সুলতানা। এরপর আমার পরম বন্ধু ও নিত্য শুভার্থী সন্তু, সাবিয়া, সঞ্জয়, বিশ্বজিৎ, মৌমিতা প্রমুখ উৎসাহ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও নানা সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, স্নেহের ছোট ভাই সন্দীপ, ইন্দ্রজিৎ, অতনু, জয়ন্ত প্রমুখ। বিশেষ ভাবে ক্ষেত্র-সমীক্ষার জন্য নানা সময়ে তথ্য ও চিত্র গ্রহণে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যারা স্বেচ্ছায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমার প্রিয় স্নেহের ছোট ভাই দেলোয়ার, মুর্শিদ এবং চাচা রসিদুল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা কে, যাদের আন্তরিক স্নেহ এবং ভালবাসা, উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা আমার এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগারিকদের কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা নানা সময়ে এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন বইপত্র দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

প্রসঙ্গত ঋণ স্বীকার করছি কোচবিহারের অগণিত প্রান্তিক ও অপ্রান্তিক হিন্দু-মুসলিম সমাজের মানুষদের কাছে এবং একই সঙ্গে ঋণ স্বীকার করছি জারি গানের বয়াতি আহাম্মদ আলী (ট্যাবলেট মুন্সি), আমিনুল ইসলাম, আয়নাল মিয়া, মমিনুল মিয়া, জনাব আলী, কপির হোসেন, সফিকুল মিয়া প্রমুখকে। যারা কেউ-ই বিমুখ করেননি ক্ষেত্রসমীক্ষা কর্মে। এ সব সম্বল করে, আমার গবেষণার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব তুলে ধরার প্রয়াস করেছি।

গোলজার

হোসেন

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুসলিম সমাজে বিশেষত শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশি ১০ই মহরমের আচার-অনুষ্ঠান এবং শোকপালন করা হয়। বাংলা তথা কোচবিহার জেলার মুসলিম সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ করার বিষয়, স্থান-কাল ব্যবধানে কোচবিহারে মুসলিম সমাজে এই আচারের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলায় এই মহরমের প্রতি আগ্রহ ও চর্চার বয়স খুব বেশি নয়। লোকসংস্কৃতির বিষয়টি পৃথক বিদ্যাচর্চা রূপে আত্মপ্রকাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়েছে। বর্তমানে মহরমকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি একটি বিস্তৃত এবং উন্মুক্ত বিদ্যাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারের মুসলিম সমাজে প্রচলিত মহরম অনুষ্ঠান এবং তাকে কেন্দ্র করে জারি গান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই অঞ্চলে মহরমের দিন ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বয়াতিদের কণ্ঠে গীত হিসেবে শোনা যায়- দীর্ঘপালা আকারে জারি গান।

কোচবিহারের মুসলিম সমাজের আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব নিয়ে বিভিন্ন প্রখ্যাত লেখক-লেখিকা তাদের অভিমত জন-সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষত মহরমের জারি গান নিয়ে তাঁরা সেরকম উদ্যোগ দেখাননি। তাছাড়া এই গান প্রান্তিক মুসলিম সমাজের ধর্মীয় লৌকিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করছে কিনা সেইসূত্রেই এই গবেষণার পদক্ষেপ। তবে কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের প্রতি ভালবাসা কিংবা সহানুভূতির দিক থেকে বিবেচনা করে এই নিবন্ধ আয়োজন করা হয়নি, অথবা দু-একদিনের চিন্তা-ভাবনা ও চেতনায় হয়ে ওঠেনি। এর জন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে।

সমগ্র গবেষণা পত্রটি নির্মাণের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য নিতে হয়েছে, তেমনি ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার ও নিজস্ব ভাবনার যোগে একটি সম্যক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছি।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১-২
প্রথম অধ্যায় জারি গানের সাধারন পরিচয়	৩-৩৭
ক) জারি গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	
খ) পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের জারি গানের পটভূমি	
গ) কোচবিহার জেলার প্রান্তিক মুসলিম সমাজে জারি গানে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রেক্ষিত	
ঘ) কোচবিহারের মুসলিম সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জারিগান	
দ্বিতীয় অধ্যায় কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের জারি গানের ঐতিহ্যের নানা প্রেক্ষিত	৩৮-৭৬
ক) জারি গানের সঙ্গে বয়াতি বা কবিদের সম্পর্ক	
খ) জারি গানের সঙ্গে মহরমের অনুষ্ঠানের সম্পর্ক	
গ) জারি গানের সঙ্গে স্থানীয় লোকগানের সম্পর্ক এবং গানের ক্রমবিবর্তন	
তৃতীয় অধ্যায় গানের লৌকিক ও সাংস্কৃতিক দিক এবং ধর্মীয় পর্যালোচনা	৭৭-১০৪
ক) সীমান্ত প্রতিবদ্ধকতার প্রভাব	
খ) লৌকিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান	
গ) গানের ধর্মীয় মতাদর্শ: দ্বন্দ্ব ও মেলবন্ধন	
উপসংহার	১০৫- ১০৬
গ্রন্থপঞ্জি	১০৭- ১১০
পরিশিষ্ট	

ভূমিকা

ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী প্রান্তিক জেলা কোচবিহার। এই জেলার উপর দিয়ে তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, ধরলা, গদাইধর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলির মতোই যুগে যুগে এই অঞ্চলে বসবাস করেছে খেন, কোচ, পালি, বোরো, রাভা, সাঁওতাল, বাজিকর প্রভৃতি জাতি-উপজাতি মানুষ। ফলে দেখা দিয়েছে, এক মিশ্র সংস্কৃতির, যার দরুন উদ্ভব ঘটেছে নানা আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবের। এমনকি এখনকার পরিবেশ, প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির থেকে অনেকটাই পৃথক। তাছাড়াও বাংলার ইতিহাসের নিরিখে কোচবিহারের ইতিহাস হয়ে উঠেছে কিছুটা ভিন্ন ধারার। বর্তমানে এই অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ রাজবংশী সম্প্রদায় নামে অভিহিত। এও লক্ষিত যে, এখানকার মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশকে রাজবংশী-মুসলিম বলা হয়। তারা কোনো এক সময়ে ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে তারা বাংলার মুসলিম সমাজের মতোই ইসলামিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব পালন করলেও তুলনামূলক ভাবে ঘরে বাইরে রাজবংশী সমাজেরই সংস্কৃতি পালন করে চলেছে। এখনও তাদের পুঁথিগত বিদ্যাচর্চা তেমন লক্ষিত হয় না। পেশাগত দিক থেকে কৃষক, শ্রমিক বা খেতমজুর, জেলে, হাজাম, সাপ ধরা বা খেলা দেখানোই গুরুত্ব পায় । অর্থাৎ সেদিক থেকে তারা প্রান্তিক জনজাতির পরিচয় বহন করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অসহায় বা দারিদ্রের অভিশাপ থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্তি লাভ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় তারা নানা আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব পালন করলেও আর পাঁচটি উপজাতির মতো তাদেরও সুখ-দুঃখের সঙ্গী অর্থাৎ নিজস্ব কিছু লোকগানের তাগিদ অনুভব করেছিল। ফলত দেখা যায়, এই অঞ্চলের জল-মাটি, আবহে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মাঝে মহরমের শোকের গান বিছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র দীর্ঘপালা আকারে জারি গানের উদ্ভব ঘটে। তারা এই ধরনের শোকের গান উপভোগ করার মাধ্যমে এক ভিন্ন ধারার সুখ লাভ করে।

আমার প্রস্তাবিত গবেষণা পত্রটি তিনটি অধ্যায়ে কোচবিহারের জারি গানের সৃষ্টির উৎস মুখ থেকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সেই ধারার সামগ্রিক চালচিত্র বর্ণিত করার চেষ্টা করেছি। বিশেষত, এই অঞ্চলে জারি গান কোন সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আগমন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা যেমন করা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একটি ভিন্নতর ধারণা গড়ে উঠেছে কিনা, সেই প্রসঙ্গকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সুদূর আরবে মোটামুটি ১৪০০ বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া কারবালা'র মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন শোক পালন করা হয়, তেমনি অন্যদিকে সাহিত্য হিসেবে শোক গীতিও রচিত হয়। এই সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত জারি গানের ঐতিহ্যের নানা প্রসঙ্গ। স্থানীয় লোকগান বিশেষত ভাওয়াইয়া, চারযুগের গান, ষাইটোল, বিষহরী, কুশান প্রভৃতি লোকগানের সঙ্গে জারি গানের নানা ভাবে আদান-প্রদান ঘটেছে। ফলত, কিছু ক্ষেত্রে যেমন জারি গানে সেই গানগুলির প্রভাব পড়েছে, তেমনি আবার কখনও কখনও সেই গানগুলিতে জারি গানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাছাড়া এই গানের যারা ধারক-বাহক অর্থাৎ বয়াতিদের জীবনের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মহরমের ভিন্ন ধরন দেখা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রান্তিক সমাজে এই গানকে কেন্দ্র করে যেমন দ্বন্দ্ব-সমঝোতা দেখা গেছে, তেমনি গানের লৌকিক-সংস্কৃতিক দিকটি লোকসংস্কৃতির জগতে একটা নতুন ইতিহাস গড়েছে কিনা সে বিষয়েও লক্ষ রাখা হয়েছে। সর্বোপরি, এই গানের নানা দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা যে একটা প্রতিকূল পরিবেশ গড়ে তুলেছে, তারও চালচিত্র বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: জারি গানের সাধারণ পরিচয়

বিশ্বের সকল জাতির নিজস্ব কিছু না কিছু সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। যা ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক আচার-আচরণ-আনন্দোৎসব ইত্যাদি বহন করে। এগুলির মাধ্যমে যেমন এক একটি জাতির বিকাশ ঘটে, তেমনি চিরকালীন মিলন, আনন্দ, শান্তির বাতাবরণ রচিত হয়। ফলে এগুলি কখনোই কোনো দিন জনসমাজ পরিত্যজ্য হতে পারে না। বিশ্বের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মতো মুসলিম সমাজেও সুদীর্ঘকাল ধরে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব এবং সঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। এই সমাজে আজও জারি, সারি, মুর্শিদি, কাওয়ালী, মারফতি ইত্যাদি লোকগান মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। তবে গানগুলির বিষয় একই হলেও অঞ্চল ভেদে তার ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি গানের উদ্ভবের এক ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, জারি গানের উদ্ভব এই বাংলায় হলেও এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কিন্তু ১৪০০ বছর পূর্বে সুদূর ইরাকের কারবালার ময়দানে ঘটে যাওয়া বিষাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই ঘটনা বাংলার মুসলিম সমাজকে যেমন নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে নতুন একটি বিষাদের অধ্যায় সূচনা করেছে।

ক. জারি গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হজরত মুহাম্মদের পরলোক গমনের কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সৃজিত ইসলাম ধর্ম মক্কা-মদিনা অতিক্রম করে দূরদূরান্তে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করে। বিশেষত 'সেই সময় সমগ্র আরব দেশ, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পারস্যের জনগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। অবশ্য তাদের মধ্যে ইসলামের পালনীয় ও প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এবং *কোরান* ও সুন্নাহ বিশ্লেষণ নিয়ে ঘোরতর কলহ ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে'[১]। বিশেষত প্রধান সমস্যা ছিল, নেতা নির্বাচনকে ঘিরে। কারণ মুহাম্মদের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন সময় তিনি এমন কিছু আভাস

দিয়েছিলেন, যার ফলে অনেকেই হজরত মুহাম্মদের জামাই হজরত আলিকে তাঁর নিবাচিত উত্তরসূরি বলে মনে করতেন। অন্যদিকে অসুস্থতার সময় তিনি হজরত আবুবকরকে নামাজের দায়িত্ব দিতেন। ফলে কেউ কেউ মনে করতেন, হজরত আবুবকরই মহানবীর যথার্থ মনোনীত উত্তরসূরি। এই সব জটিল সমস্যা দেখা দিলে, তার সমাধানের জন্য যেমন হজরত মুহাম্মদের মতো কোনো পাণ্ডিত্য ব্যক্তি ছিল না, তেমনি অকাট্য সমাধান দেওয়ার জন্য মহানবীও তখন উপস্থিত ছিলেন না। তাই এই অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে 'খারিজি, শিয়া, মুরযিলা, কাদেরীয়া'[2] প্রভৃতি বেশ কিছু সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ফলত মহানবীর মৃত্যুর পর থেকে এই সব দলের নেতাগন নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দাবি রাখে। হজরত আলীর সমর্থকরা বলেন, মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব ন্যস্ত থাকা দরকার মহানবীর পরিবারের উপর। বিশেষত এই যুক্তিতে যারা বিশ্বাসী তারা পরবর্তীকালে 'শিয়া' নামে পরিচিত হন। অন্যদিকে মুসলিমদের অপর একটি বড়ো অংশ আবুবকরকে সমর্থন করে বলেন, রসুলুল্লাহ তাঁর উত্তরসূরি মনোনয়নের ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাই তারা আবুবকরকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করতে চান। এই পরিস্থিতিতে আবুবকর খলিফা নির্বাচন হলে কলহ ও সংঘাত আরও বেড়ে যায়। বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আলীপন্থী অর্থাৎ শিয়া গোষ্ঠীরা। ঘটনার আবর্তে আবুবকরের পরে ওমর খলিফা নির্বাচিত হন। ওমরের পরে উমাইয়া সম্প্রদায়ের ওসমান খলিফা নির্বাচিত হলে আলীর দল তাও মেনে নিতে পারেনি এবং তারও বিরোধিতা করে। প্রায় বারো বছর পর 'ওসমান আততায়ীর তরবারির আঘাতে প্রান হারান ৫০ হিজরি মতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে'[৩]। তাঁর স্থানে চতুর্থ খলিফা হিসেবে আলিকে অধিষ্ঠিত করা হয়। অবশ্য পূর্বাপর গোষ্ঠীয় বিদ্বেষ এবং সংঘাত অব্যাহত থেকেই যায়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও নতুন দুটি গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একদল ছিল আলীর পক্ষে তারা মনে করে, নির্বাচন মাত্রই বেআইনি, কারণ নেতা হবার জন্য আলীর স্বর্গীয় অধিকার আছে। মক্কার উম্মাইয়া বংশের সন্তান মোয়াবিয়ার (আবু সুফিয়ানের পুত্র ও হজরত উসমানের ভ্রাতুস্পুত্র) গঠিত অপর দল আলীর বিরোধিতা করে। এছাড়াও ওসমান হত্যাকারীর শাস্তি বিধান এবং অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে আলীর সঙ্গে মোয়াবিয়ার মতের বিরোধ দেখা দেয়। ফলে '৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার শিফিন নামক স্থানে বড়ো ধরনের যুদ্ধ

সংঘটিত হয়’[৪]। যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত থাকে এবং আপোষ- মীমাংসার দ্বারা তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আলী ষড়যন্ত্রের স্বীকারে ৬৬১ সালে কুফার মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করার সময় ইবনে মুলজামের তরবারির আঘাতে নিহত হন’[৫]। আলীকে হত্যার ফলে আরব বিশ্বে মুসলমান সমাজে বিভেদ ও অনৈক্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম চারজন খলিফার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও পার্থিব ক্ষমতার লড়াই দেখা গিয়েছিল তা না থেমে বরং সমান্তরাল ভাবে অব্যাহত থাকে। আলীর মৃত্যুর পর কুফাবাসী হজরত আলীর বড় ছেলে আল-হাসানকে খলিফা বলে স্বীকার করে নেন। এ সময় মুয়াবিয়া বা মাবিয়া দেখলেন, হাসানকে কোনো ভাবে পরাজিত করতে পারলে মুসলিম বিশ্বে তিনি ক্ষমতার অধিকারী হবেন। প্রথমে তিনি হাসানকে খলিফা স্বীকার করলেও, পরে তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলত সাবাত নামক স্থানে উভয়েই মুখোমুখি হন এবং তাদের মধ্যে দু-একটি যুদ্ধ হলেও গৃহ যুদ্ধে কথা ভেবে উভয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সন্ধি করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া পুত্র ইয়েজিদ নিজের বংশের মধ্যে খলিফার ক্ষমতা বজায় রাখার ষড়যন্ত্রে অব্যাহত থাকেন। তিনি ইমাম হাসানের চতুর্থ স্ত্রী জায়েদাকে বিবাহ এবং প্রচুর মোহরের লোভ দেখিয়ে বশ করে নেন। ফলে জায়েদাকৃত বিষপান করে ইমাম হোসেন শাহাদত বরণ করেন। হাসানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হোসেনকে ইরাকবাসী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে বলেন। কিন্তু ‘৬৮০ সালে মোয়াবিয়ার মৃত্যু হলে পূর্ব সন্ধির শর্ত অমান্য করে ইয়াজিত খলিফার আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিরোধীদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার শুরু করেন’[৬]। কিন্তু কুফাবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে হোসেনকে আমন্ত্রণ করেন। কুফাবাসীর আমন্ত্রণে স্বাগত জানিয়ে হোসেন বন্ধুদের সব বাধা অগ্রাহ্য করে প্রিয়জনদের নিয়ে মক্কা থেকে কুফা যাত্রা করেন।

সেই পথে তিনি খবর পান তাঁর একান্ত অনুগত মোসলেম’কে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তিনি যতই এগিয়ে যান ততই খারাপ খবর আসে। বিশেষত, ‘মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের বাহিনীর কথা শুনে হোসেনের দুর্ধর্ষ বেদুইন সৈন্যরা দল ছেড়ে চলে যায়। হোসেনের সঙ্গে থাকে মাত্র চল্লিশটি ঘোড়া এবং ৭২ জন অনুগামী। এই পরিস্থিতিতে হোসেনের বাহিনী কুফা থেকে ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ফোরাদ নদীর তিরবর্তী কারবালার প্রান্তরে শিবির গড়ে তোলেন’[৭]। ‘ইমাম হোসেন নিজের সংরক্ষিত

পানি দিয়ে আপন পরিবারের লোক, সৈন্য এবং অশ্বের তৃষ্ণা নিবারণ করেন (মহরম মাসের ৪ তারিখ)। কিন্তু ৭ই মহরমে ইমাম হোসেন-এর পরিবারে পাণির সংকট দেখা দেয়'[৮]। তাই ইমাম হোসেন তাঁর ছয় মাসের শিশুপুত্র আলী অসগরকে কোলে নিয়ে শত্রু সৈন্যর কাছে পাণির আবেদন করেন। তারা পাণির বদলে তীর নিক্ষেপ করলে শিশু আলী অসগরের মৃত্যু ঘটে এবং তিনি আত্মসমর্পণ করলেও পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য মনোভাব ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে কারবালার ময়দানে ইয়াজিদ সেনাদের হাতে অবরুদ্ধ ইমাম হোসেন তার প্রিয়জনদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে। কারণ শত্রু একমাত্র তাকেই চায়। কিন্তু তারা সকলেই একই বাক্য বলে ওঠে, 'আল্লাহর কসম। আমরা কখনও এটা করব না, আপনার পরে আল্লাহ যেন আমাদেরও জীবিত না রাখেন'[৯]। একদিকে যেমন তাঁর প্রিয়জনরা তাঁকে ছেড়ে যেতে না চাইলেও ইমাম হোসেন পুনরায় সবাইকে ফিরে যাওয়ার সুপরামর্শ দেন অন্যদিকে তেমনি যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে তিনি শত্রুদের উদ্দেশ্যে এক মর্মান্তিক ভাষণ দেন-

> তারা যদি ইমাম হুসেনের প্রতি সুবিচার করে, তবে তারা সৌভাগ্যশালী মানুষ বলে পরিগণিত হবে, আর যদি তা না করে তবে আল্লাহ-ই তাঁর একমাত্র সহায়। আল্লাহ সৎ বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন। ইমাম হুসেইনের বংশ পরিচয় ও মান-মর্যাদার কথা তাদের জানা আছে। তাঁকে অপমান বা হত্যা করা শোভা পায় কিনা, তা তারা নিজেদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে। তিনি নবীকুলের শিরোমণি হজরত মহাম্মদের(স.) দৌহিত্র, প্রথম ঈমান গ্রহণকারী হজরত আলীর পুত্র। হাসান ও হুসাইন বেহেস্তে যুবকদের নেতা হবেন মর্মে মহম্মদ যে হাদিস প্রচার করেন, তাও তাদের অনেকের জানা আছে। সে হাদিস জানার পরও কি তারা তাঁর রক্ত ঝরানো থেকে বিরত হবেন না[১০]।

এই ভাষণের ফলে শত্রু পক্ষের শিবিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিছু সৈন্য ইয়াজিদের দল ত্যাগ করে হোসেনের পক্ষে যোগ দেন। কিন্তু তাতেও যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। সেই পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবারের অনেকেই মারা গেলেও শত্রু পক্ষ সহজে হোসেনকে আঘাত করতে সাহস পায়নি। ইমাম হুসাইনের শত্রুর উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ভাষণ ছিল-

> ওরে কুফাবাসী, তোমরা কি আমাকে হত্যা করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে। আল্লাহর কসম আমার হত্যায় আল্লাহ যত অসন্তুষ্ট হবেন, আমার পর আর কোন বান্দার হত্যায় তত অসন্তুষ্ট

হবেন না। আমাকে আল্লাহ অবশ্যই সম্মানিত করবেন। কিন্তু তোমাদের ওপর থেকে তিনি এমন মর্মান্তিকভাবে প্রতিশোধ নিবেন, যা তোমরা ভাবতেও পার না[১১]।

অবশেষে পানির পিপাসার্ত হোসেন ফোরাদ নদীর ধারে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রিয়জনদের কথা ভেবে নিজে পাণি পান না করে মশক-ভর্তি পাণি নিয়ে যাওয়ার সময়ই শত্রুপক্ষের সৈন্যের হাতে চরম অত্যাচারের স্বীকার হয়ে মারা যান। তাঁর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ইয়াজিতের দরবারে পাঠানো হয়। হোসেনের প্রিয় দুলদুল ঘোড়া তীরবিদ্ধ অবস্থায় শিবিরে ফিরে যায়। শিবিরের ধন সম্পদ লুট করে এবং পরিবারের সকলকে বন্দী করে দামাস্কাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভাবে শেষ হয় কারবালার যুদ্ধ। যা মুসলিম ইতিহাসের এক শোকাবহ অধ্যায় নামে চিহ্নিত হয়।

কারবালার মর্মান্তিক স্মৃতি বহনকারী মহরম মাসের দশ তারিখ মুসলিম সমাজে তাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। তাই এই মাস আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের জন্য শোক দিবস হিসেবে আশুরা এবং কারবালার চিত্র সামনে ফুটে ওঠে। বিশেষত আশুরা বা দশ মহরম, এই মাস ধর্মীয় দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন-

> তিনি মদীনায় গমন করে দেখতে পেলেন, সেখানকার ইহুদীগণ আশুরার রোজা পালন করে থাকে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন-তোমরা কেন এইদিনে রোজা রাখ। তারা জবাব দিল এটা একটা মহান দিন। এই দিনে আল্লাহ তা আলা হযরত মুসাকে এবং তাঁর অনুসারিদিগকে ফেরাউনের কবল হতে নাজাত দেন এবং ফেরাউন ও তাঁর দলবলকে নীল নদে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন। অতঃপর হযরত মুসা আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এইদিনে রোজা রাখেন। এই জন্যেই আমরা এই দিনে রোজা পালন করে থাকি। তাদের জবাব শুনে হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমরা তোমাদের হযরত মুসা (আঃ) এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং নীতি অনুসরণ করার দাবিও তোমাদের চেয়ে আমাদের বেশি। অতপর হজরত রসূলুল্লাহ (সা.) নিজে এই দিনে রোজা রাখলেন এবং অন্যান্যকেও এই দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন (বোখারি-মুসলিম)[১২]।

ইহুদিদের বিরোধীতা করার উদ্দেশ্যে তিনি আশুরার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দিনেও রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তাদের অবিকল অনুকরণ না হয়। পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ‘যদি কোনো ব্যক্তি আশুরার রাতে

সোবহে সাদেকের (ভোরের) পূর্বক্ষণে বারো রাকাত নফল নামাজ আদায় করে, আল্লাহ পাক তার সমস্ত গোণা মাফ করে দেবেন। তাকে বহু সাওয়াব দান করা হবে এবং সে ব্যক্তি বেহেশতের নেয়ামতের পূর্ণ হকদার হবে’[১৩]। তাই দেখা যায়, একদিকে মহরম-আশুরার ধর্মীয় আচার অন্যদিকে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের পুনর্জীবনের ইতিহাস অপূর্ব ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে-

‘মহরম শব্দের অর্থ সম্মানিত, মর্যাদাবান, নিষিদ্ধ, হারাম। এই মাসে আরবরা যুদ্ধ বন্ধ রাখে। এই বিধান মুসলিমদের এখনো বলবৎ রয়েছে, তারা আক্রান্ত না হলে আক্রমণ শুরু করে না’[১৪]। এজন্য মহরমকে মহবুল হারাম বা সম্মানিত অর্থে মহরম নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারবালার শোকাবহ ঘটনার প্রভাব অন্য সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে। মাওলানা আজাদের ভাষায়, ‘আমরা এর অন্যান্য দিকগুলো ভুলে যাই। এমনকি হজরত ইমাম হোসেন কোন আদর্শের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন মহরম উদযাপনে আমরা তারও খেয়াল করি না, অথচ তাঁর ভাষ্য থেকেই তা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়’[১৫]।

বিশেষত হিজরি ১০ই মহরম শহীদের কফিন সাজিয়ে মিছিল করা, শিকল পরিধান, মর্শিয়া, তাজিয়া, মাতম ইত্যাদির মাধ্যমে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের মহরম পালন করতে দেখা যায়। এর প্রাথমিক উৎপত্তি ঘটে ‘মেসোপটেমিয়ায়। শিয়া মতবাদ গড়ে ওঠার সময় ঐ অঞ্চলে আয়াদমিম অজুদ পূজার প্রচলন ছিল। এই দেবতার শব নিয়ে, হা-হুতাশ করতে করতে বের হত শোক মিছিল। এর দেখাদেখি শিয়ারাও ইমাম পরিবারের তৃষ্ণা ও দুর্দশাকে কেন্দ্র করে শোক মিছিল এবং তাজিয়া, মাতম ইত্যাদির প্রচলন করে’[১৬]। কিন্তু প্রথম দিকে সুন্নিরা তো দূরের কথা শিয়ারা পর্যন্ত এই আচার পালন করত না। *জালাউল উয়ুন* গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘মাতম করা ইয়াজিদের সুন্নত আবিষ্কার, তাঁর দেখাদেখি কুফার শিয়ারা মাতম করে। অতঃপর উম্মতে মোহাম্মদীয় হত্যাকাণ্ডে হাজ্জাজের পরবর্তী দ্বিতীয় মোখতার ছাকাফী মাতম করে এর কয়েক শ’ বছর পর মোয়েজুলদ্দৌলা তাজিয়া প্রথা চালু করেন’[১৭]। ‘বাগদাদে মইজুদ্দৌলার রাজত্বকালে হিজরী ৩৫২ সনে প্রথম ইমাম হোসেনের বিয়োগান্ত ঘটনা লইয়া মহররমের দশম দিবসে শোক তাপ প্রকাশ করা হয়। লোক দলে দলে কারবালার তীর্থ করিতে গমন করে’[১৮]।

মহরমের আচারকে কেন্দ্র করে এই ধরনের নানা বিতর্ক দেখা গেলেও আজও মুসলিম সমাজের সুন্নিরা নীরবে শোক পালন করে। শিয়ারা এই দিন তাজিয়া সহযোগে মিছিল করা, শিকল পরিধান, মর্শিয়া, তাজিয়া, মাতম ইত্যাদির পালন করে।

খ. পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের জারি গানের পটভূমি

বাংলাদেশে সুফিবাদের সূচনা কাল শুরু হয় একাদশ শতকে শাহ সুলতান রুমি (১০৫৩ সাল) আগমনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু লক্ষ করা যায়, 'বাবা আদম বিক্রমপুরে মহারাজ বল্লাল সেনের (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু) সঙ্গে যুদ্ধ করে শহিদ হন (ধর্ম যুদ্ধে নিহত) এবং তাহার পর ময়মনসিংহের শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমির (১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন) ও জালাল-দ-তবরিযীর আগমন ঘটে। বলাই বাহুল্য তখনও এই বঙ্গে সরাসরি কোনো মুসলিম সাম্রাজ্যের আক্রমণ ঘটেনি। জালাল-দ-তবরিযীর আশ্রয়ে হাজার হাজার দরিদ্র, দুঃস্থ, নিরন্ন ও পরিব্রাজক আহার্য্য লাভ করিত। দরবীশের অলৌকিক মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা লক্ষ্মণসেন-ই তাহার শুভেচ্ছা পরিপূর্ণার্থে মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়'[১৯]। অন্যদিকে 'আরব সেনানায়ক মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু জয় করেন আট শতকের দ্বিতীয় দশকে আর বক্তিয়ার খলজি বাংলায় আসেন তেরো শতকের প্রথম দশকে'[২০]। এ বিষয়ে আরও, ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দিনের *তবাকৎ-ই-নাসিরি* গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> যে বখতিয়ার বিহার জয় করে নদীয়া আক্রমণ করেন। বখতিয়ার নদীয়ার উদ্দেশ্যে এমনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে মাত্র ১৭ জন সৈনিক তাঁর সঙ্গে ছিল এবং মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তাহাদের অশ্ব বিক্রেতা মনে করে নদীয়াতে অনুপ্রবেশে তাদের প্রতি কোনো সংশয় সৃষ্টি হয় নাই। এ সুযোগে তিনি সরাসরি রাজপ্রাসাদে গমন করে নিজ ভাবমূর্তি উন্মোচন করেন এবং আকষ্মিক আক্রমণে প্রাসাদ দ্বার-রক্ষীদের পরাস্ত করেন। তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্ন আহারে রত ছিলেন। এ আকষ্মিক ঘটনায় তিনি বিভ্রান্ত হয়ে রাজপ্রসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে নগ্ন পায়ে বঙ্গ (পূর্ব) ও সমতটে পলায়ন করেন'[২১]। ঐতিহাসিক এম.এ রহিম বলেছেন, মুসলমানদের বাংলা জয়ের পরে প্রচুর সংখ্যক ইরানি ব্যবসায়ী, সাধু পুরুষ, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক ও ভাগ্যান্বেষণ বাংলায় আগমন করেন ও বসতি স্থাপন করেন[২২]।

ফলত বাংলায় একদিকে যেমন মুসলিম শাসকের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি অন্যদিকে দলে দলে মুসলমান বণিক ও সুফি দরবেশদের আগমন ঘটে। মুসলমান আগমনের বিস্তারিত বর্ণনা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে তুলে ধরেছেন, এইভাবে-

'কলিঙ্গ-নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘরবাড়ী
নানা জাতি বীরের নজরে
পাইয়া বীরের পান বৈসে যত মুসলমান
দিলেন পশ্চিম দিকে তারে।।
আইল চড়িয়া তাজি সৈয়দ মৌলানা কাজি
খ্যরাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুবের পশ্চিম পটি বোলয়ে হাসন হাটি
বইসে কলিঙ্গ দেশে ছাড়ি।।
ফজর সময় উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ'[২৩]।।

আমরা জানি, সুফি সাধকদের আগমনের পূর্বে এই বাংলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ বসবাস করতেন। বিশেষত সেই সময় হিন্দু সমাজে বর্ণবৈষম্য প্রথা চালু ছিল। যেখানে বিনা কারণে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নানা ভাবে অত্যাচার করত। এমনকি শিক্ষা গ্রহণ তো দূরের কথা তাদের সামাজিক মর্যাদা বা ধর্মীয় অধিকার বলতে তেমন কিছুই ছিল না। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তাদেরকে শোষণ করা হত অত্যন্ত নির্মম ভাবে। মোট কথা, সমকালীন সমাজ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথাতেই পরিচালিত হত। সেই পটভূমিকায় এই অঞ্চলে সুফিদের আগমন ঘটেছিল। সেই সময় সমাজে চলতে থাকা সামন্ততান্ত্রিকতার যে তীব্র শাসন, তাঁর বিপরীত সুরে সুফিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় শান্তিরবাণী। মানুষের সামাজিক মর্যাদার অধিকার জনসম্মুখে তুলে ধরার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তারা প্রচার করেন, মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই, সাদা কালো কোনো ভেদাভেদ নাই। বিলাসিতার পরিবর্তে তারা নির্জনবাস, দারিদ্রতা পছন্দ করতেন এবং নানা ক্ষেত্রে তারা অলৌকিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। সেই সব সমাজ বিমুখ মানুষেরা অতি সহজেই সুফিদের মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের

প্রতি অসামান্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা শুরু করেন এবং নানা সমস্যা সমাধান করে নেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে হাজির হতে থাকেন। এমনকি সাধারণ মানুষ তাঁদের মৃত্যুর পরবর্তীকালে কবরে গিয়ে মানত করত। যা আজও এই বাংলা এবং বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে। তাছাড়া যেহেতু তারা ধর্মীয় ব্যাপারে কঠোরতার পরিচয় দেননি, তাই সমাজ বিমুখ মানুষেরা ইসলাম ধর্মের পালনের সঙ্গে পূর্ব পুরুষের সংস্কৃতিও পালন করত। ফলত, হিন্দু সমাজের মূর্তি পূজা বা বৌদ্ধ ধর্মের সমাধি পূজার অনুকরণে পীরের মাজারে চাদর চড়িয়ে এবং মোম-ধূপ জ্বালিয়ে মানত করার প্রথা দেখা যায়। এছাড়া চৈত্র মাসে চড়কের আচার উপলক্ষে বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় কিছু লোককে পিঠে বড়শীবিদ্ধ করে চড়কের গাছে ঘুরানো হয়। এই ভূতপূর্ব ঘটনার সঙ্গে শিয়া সম্প্রদায়ের মহরম পালনের কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও আজও এই বাংলার মুসলিম সমাজে নানা মিশ্র সংস্কৃতি পালন করে যা হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের (যেমন- বিয়ের সময় গায়ে হলুদ, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান) সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। অন্যদিকে নানা সময়ে এই বাংলায় মাটি থেকে উদ্ভব ঘটেছে জারি, সারি, মুর্শিদি, কাওয়ালী, মারফতি ইত্যাদি লোকগান। এমনকি এই বাংলায় বিভিন্ন সময় মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা*, দৌলত কাজির *লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না* এবং মীর সৈয়দ সুলতান কৃত *জ্ঞানচৌদিশা*, শেখ চাঁদ কৃত *হরগৌরী সম্বাদ*, *তালিব নামা বা শাহ্দৌলাপীরনামা*, অজ্ঞাতনামা কবি কৃত *যোগ কলন্দন*, হাজী মহম্মদ কৃত *সুরতনামা*, মীর মহাম্মদ শফী কৃত *নুরনামা*, কাজী শেখ মনসুর কৃত *সিরনামা*, আলী রজা কৃত *আগম ও জ্ঞানসাগর* প্রভৃতি অসামান্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এই ভাবে লক্ষ করা যায়, বাংলায় সুফি মতবাদকে ঘিরে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের উদ্ভব ঘটেছে। এই যে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির একটা বিরাট অংশ উদ্ভব ঘটেছে তার পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সুফিবাদের প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে তাঁরাই এই বাংলার মুসলিম সমাজে বিশেষত মহরম কাহিনি বাংলায় বয়ে এনেছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় এই ঐতিহাসিক বেদনাদায়ক ঘটনা উপর নির্ভর করে অঞ্চল ভেদে যেমন আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি এই আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব ঘিরে উদ্ভব ঘটেছে জারি বা মর্শিয়া বা জঙ্গনামা গানের। ফার্সি শব্দ 'যারী' থেকে বাংলা জারি শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। যার অর্থ

আত্মনাদ, বিলাপ, খেদ। অর্থাৎ জারি গান হচ্ছে বিলাপের গান'[২৪]। বাংলাদেশের গবেষক ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী তাঁর *লোকসংগীত* গ্রন্থে জারিগানের আটটি ভাগের উল্লেখ করেছেন, 'মর্শিয়া জারি, মাতম জারি, নাড়া জারি, চালি জারি, জর জারি, ব্যাঙ জারি, রচনা জারি, জারি যাত্রা'[২৫]।

বাংলার মুসলিম সমাজে কারবালার বিষাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা বিয়োগান্ত মূলক লিখিত এবং মৌখিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। তবে তার প্রাথমিক উৎস আরবের আলী মিখাইল -এর *কিতাব মকতুল হুসাইন* রচনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ইরানে ইসলাম প্রচারিত হলে, 'বাদশাহ তাহমাসপের শাসন আমলে দিওয়ান ও মুর্সিয়া শ্রেণির রচনার বিকাশ ঘটে। ষোল শতকের কবি মুহতাশাম কাসানী ও মুকবিল ইমান, হোসেনের মৃত্যু ও তাঁর পরিবারের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মর্শিয়া রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন'[২৬]। ভারতীয় উপমহাদেশে কারবালার কাহিনি নিয়ে সিন্ধি, উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। 'আব্দুল লতিফ ভিট্টাই সিন্ধি ভাষায় এবং লক্ষ্মৌর কবি মীর বাব্র আলী ও মির্জা সালামত আলী দবির উর্দু ভাষায় মুর্সিয়া রচনা করেন । সৈয়দ সাবির আলী শাহ দাখিনি উর্দু ভাষাতে অনুরূপ কবিতা রচনা করেন'[২৭]। তেরো শতকের শুরুতে এই অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ঘটলেও দীর্ঘকাল পরে অর্থাৎ শেখ ফয়জুল্লাহ জয়নবের *চৌতিশা* এবং মুহম্মদ খান *মকতুল হুসেন* (১৬৪৫) কাব্য রচনা করেন'[২৮]। এই দুটি কাব্য রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে মহরম বিষয়ক তেমন ভাবে কোনো রচনা পাওয়া যায় না। এরপর আমরা এই বাংলার বুকে নানা কাব্য রচনার প্রয়াস দেখতে পাই। আঠারো শতকে হেয়াদ *মামুদ মহরম পর্ব (১৭২৩), শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা* ইত্যাদি অসামান্য পুঁথিকাব্য রচনা করেন। উনিশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন উপন্যাসধর্মী *বিষাদসিন্ধু* (১৯৩৫) রচনা করেন। এই ভাবে লিখিত সাহিত্যের ধারাটি লক্ষ করা গেলেও দীর্ঘদিন পরে মৌখিক ধারাটি সংগ্রহ করতে শুরু করা হয়। জয়নারায়ণ ঘোষালের *করুণানিধান বিলাস* (১৮১৩-১৪) এবং ঝিনাইদহের অধিবাসী পাগলা কানাই(১৮২৮-৮৯)এর *নানা লোকগান* রচনার মাধ্যমে এই জারি গানের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। মৌখিক সাহিত্য বিশেষত জারি গান সম্পর্কে কবি জসিমউদ্দিন তাঁর *জারীগান* গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন-

খুলনা, বরিশাল ও দক্ষিণ ফরিদপুরের রাজৈড়, মাদারীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পুঁথির ভাজ নামে এক প্রকার গ্রাম্য গানের প্রচলন আছে। এই গানের দলপতিরা ছড়ার সুরে জারি গানের গল্পগুলি বর্ণনা করিয়া থাকে। জারিগানের উপরে যেমন পুঁথি-সাহিত্যের ছায়া পড়িয়াছে, আমার মনে হয়, পুঁথি-সাহিত্যের উপরেও কোন কোন জায়গায় জারি গানের প্রভাব পড়িয়াছে। জারি গানের সঙ্গে কবিগানের তুলনা করা যাইতে পারে। হয়ত এই দেশী কবিগানের অনুকরণেই আমাদের মুসলিম সমাজে জারিগানের প্রচলন হইয়াছিল[২৯]।

এরপর তিনি এ প্রসঙ্গে আরও ধুয়াগানে'র কথা উল্লেখ করেন এবং পাগলা কানাই, ফরিদপুর জেলার হাকিম চান্দ, মেহের চান্দ বয়াতী, আফাজদ্দীন প্রমুখ প্রসিদ্ধ জারিগায়কের বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার ব্যাখ্যা থেকে অতি সহজেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে কীভাবে জারি গান পালা গানে রূপান্তরিত হয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে মহরমের অনুষ্ঠানকে ঘিরে দুটি ধারার জারি গান লক্ষ করা যায়-

ক) কেবল মাত্র মহরমের উপলক্ষে জারি গান।

খ) মহরমের অনুষ্ঠান ছাড়াও বছরের নানা সময়ে পালা আকারে জারি গান।

বাংলার মুসলিম সমাজে সার্বিক ভাবে লক্ষ করা যায়, মহরমের উৎসবের দিন শিয়ারা বেশি শোকপালন করে অন্যদিকে সুন্নিরা তাদের থেকে তুলনামূলক কম শোকপালন করে। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলিম শিয়া-সুন্নি মতভেদকে অমান্য করে মহরমের দিন কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে শোকপালন করে। সেদিন ঢাক, ঢোল সহ তাজিয়া নিয়ে মিছিল করে, নকল যুদ্ধের আয়োজন করে, লাঠি খেলা চলে, কোথাও কোথাও নিজের শরীর নানা ভাবে আঘাত করে রক্তাক্ত করে।

বস্তুত মুর্শিদাবাদের নবাব বংশে মহরম উপলক্ষে মোট নব্বই দিন ধরে শোকপালন করা হয়। বর্ধমান জেলার কেতুপুর থানার আনখোনা গ্রামে মহরম পালনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, আজকের দিনে আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক পিপাসার্তের মুখে সুশীতল মিষ্টি পানীয় তুলে দিতে চাই- যে যন্ত্রনা নিয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন হজরত হোসেন- বিশ্ব আত্মার তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যমে প্রশমিত হোক তা[৩০]।

এই ভাবে যদি বাংলার মুসলিম সমাজের মাঝে মহরমের অনুষ্ঠানে লক্ষ করি তাহলে দেখবো যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভাবে মহরম পালন করা হয়। যেখানে প্রত্যেক

এলাকার জনসাধারণের যে একটা পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির ধারা থাকে তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। যা তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে পরিচিত।

অন্যদিকে মহরমকে ঘিরে সেদিন জারি গান গাওয়া হয়। যেটা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ। এলাকাভেদে এই বিষাদের গানকে কোথাও জারি গান বলা হচ্ছে আবার কোথাও মর্শিয়া বা জঙ্গনামা বলা হয়। আবার গানের অনুষ্ঠান পালন করার সময়ও অঞ্চল ভেদে ভিন্নতার পরিচয় পাই। বিশেষত মালদা ও মুর্শিদাবাদে মহরমের গান করার সময় একজন মূল গায়ক যিনি থাকেন তিনি গীত পরিবেশন করেন এবং তাঁর চারপাশে গোলাকার ভাবে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন তারা গীতের ধুয়া ধরে মাঝে মাঝে সমবেত সুরে গান করে এবং দু-হাত দিয়ে বুকের উপর আঘাত করেন। তাঁদের পরনে থাকে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা, মাথায় সাদা অথবা কালো পাগড়ি। এই প্রসঙ্গে একটি গানের উল্লেখ-

> ‘শোন গো মা ফাতেমা তোমারে জানাই
>
> ইজিতের ওই জুলুমে কারবালার লাল হয়ে যায়
>
> পিপাসার পানি বিনে কারবালার জমিতে কত না প্রাণ গেল’[৩১]।

সেদিন এই ধরনের নানান গান করা হয়। তবে অঞ্চল ভেদে এর ধরনেরও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজে প্রচলিত মহরম বিষয়ক গান গুলিকে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি বিদ উমেশ শর্মা বলেছেন- ‘মুশির্য়া’ যেখানে তিনি পুরুষ এবং নারীর উভয়ের গানের উল্লেখ করেছেন, বিশেষত তিনি নারী কণ্ঠে ‘জারি মুশির্য়া’ নামকরণ করে বলেছেন, ‘সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার মহিলারা এখানে সমবেত হন। মাতম বা শোক প্রকাশ করে থাকেন। সেই শোক প্রকাশের প্রধান বিষয়বস্তু হল দাস্ত কারবালার’[৩২]। ‘নারীদের নেই পুঁথিগত শিক্ষা। কাহিনী ও ভাবের যথার্থতা নিয়ে এঁরা কারো কাছে সবিশেষ দায়বদ্ধ নন। চিরাচরিত শ্রুতি নির্ভর পরম্পরাগত কাহিনির সঙ্গে অপটু ও অননুশীলিত কণ্ঠে মাঝে মাঝে সুত্র হারিয়ে যায়’[৩৩]। একটি গানের উল্লেখ করা যাক-

> ‘এলা ভাইয়ের শোকে কান্দে হোসেন

সোনার দেহা তার মাটিতে লুটায় রে-

হায়, আল্লা হায়'[৩৪]।

এভাবে নারী সমাজে 'জারি মুশির্য়া' প্রচলন থাকলেও পুরুষ সমাজে এই গানে জারি শব্দটি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'মুশির্য়া' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন- শোকগীতি, জনশিক্ষা ও মনোরঞ্জন। শোকগীতির একটি অংশের উদাহরণ,

'আছিলো হজরত আলী মদিনা শহরে

তলওয়ারো খাইলো আলী মসজিদেররো উপর-রে

হায় হায় হায়, বোল রে- হায় হায় হায়'[৩৫]।

জনশিক্ষা ও মনোরঞ্জন মশির্য়া গানের একটি উদাহরণ,

'ওরে মুন্সিটায় ফতোয়া দেছে

খাওয়া না যায় ভাই, বেটির পণ

লুকার খরচা লেছে কতোজন।

ঐ যারা লুকায় বেচাছে বেটি

হুমায় করেছে জুম্মা ইমামতি- ঐ দ্যাখ হা'[৩৬]।

উত্তরবঙ্গের আমরা বিভিন্ন ধরনের মশির্য়া কেন্দ্রিক লোকগানের পরিচয় পাই। এমনকি মহিলাদেরও একধরনের জারি গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন ধারার গানের পরিচয় লাভ করেছি।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, প্রথম ধারার জারি গানেও স্থানীয় লোকায়ত সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ধারার জারি গানে প্রথম ধারার জারি গানের তুলনায় বেশি লোকায়ত ভাবনার মিশ্রণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধারার জারি গানে যেহেতু কবিগান, পুঁথি ভাঁজ গান, ধুয়া গানের মিশ্রণে এক নতুন স্বতন্ত্র জারি গানের আগমন ঘটেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে সমাজের বাস্তবতার নানা চালচিত্রের বর্ণনা উপস্থিত রয়েছে। যা বয়াতিগণ অতি সাধারণ ভাবে জনসম্মুখে তুলে ধরেন। সেই কাহিনিগুলির মধ্যে গ্রাম্য অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে লোক-কবিদের অসামান্য প্রতিভার

মিশ্রণ রয়েছে। ফলে আরবের ঐতিহাসিক কাহিনি হলেও বাংলাদেশের লোক-সমাজের কাহিনিই বেশি মাত্রায় বহন করেছে। সেক্ষেত্রে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সেগুলির মধ্যে যে সাধারণ মানুষের ইতিহাসের নানা দিকের পরিচয় রয়েছে, সেবিষয়ে দ্বিমত না থাকারই কথা।

গ. কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজে জারি গানে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক প্রেক্ষিত

কোচবিহারের মুসলিম সমাজের জারি গানের উদ্ভবের পিছনে যেমন ভৌগোলিক অনুকূল পরিবেশ নানা ভাবে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি এই অঞ্চলের জল-মাটির আবহে জারি গান হয়ে উঠেছে সংস্কৃতি মূল অঙ্গ।

আমরা জানি, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জীবন-জীবিকা ও জৈবিকতার সম্পর্ক সব সময়ের জন্য অত্যন্ত নিবিড় থাকে। তাই কোনো অঞ্চলের ইতিহাস, সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার পূর্বে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ বা পরিসীমার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। সেইসূত্রে কোচবিহারের মুসলিম সমাজে জারি গান উদ্ভবের পিছনে ভৌগোলিক পরিবেশ এবং পরিসীমা বর্ণনা ব্যক্ত করা হল-

উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা। অবস্থানগত দিক থেকে এই জেলার উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। তাই সাধারণত ভাবে কোচবিহার প্রান্তিক জেলা বলা হয়। তাছাড়া কোচবিহার ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ুর কারণে বরেন্দ্রী অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি আগাগোড়াই বাংলা থেকে আলাদা লক্ষ করা যায়।

> অবস্থানগত দিক দিয়ে ২৫°৫৭′৪০″ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩২′২০″ উত্তরাংশ এবং ৮৮°৪৭′৪০″ থেকে ৮৯°৫৪′৩৫″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের সঙ্গে এই জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা ৪৫৯.৪৫ কিলোমিটার[৩৭]।

কোচবিহারের মুসলিমরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকলেও আজও তাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কারণ এই অঞ্চলে অগণিত জলাভূমি ও নদী রয়েছে। তাদের মধ্যে

তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, ধরলা, গদাইধর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ষার সময় এই নদীগুলিতে বন্যা দেখা যায় এবং সেই বন্যার জল প্রতিবছর চাষের জমিতে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক ভাবেই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পলি জমে যায়। ফলত, জমির উর্বরশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জমি সুফলায় পরিণত হয়। এইদিক থেকে নদী যেমন মানুষের কাছে আশীর্বাদের পাত্র হয়েছে, তেমনি আবার নানা সময়ে অভিশাপের ভাণ্ডারও বয়ে এনেছে। বিশেষ করে এই নদী খরা-বন্যা উপর মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। প্রত্যেক বছরে কমবেশি নদীগুলির বন্যার ফলে বহু বাড়ি-ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমত অবস্থায় জেলে ও পশুপালক সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা সঙ্কট দেখা যায়। প্রতি বছরেই মানুষকে এই ভাবেই প্রকৃতির অভিশাপ সহ্য করতে হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, নদীগুলির বন্যার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় রাজবংশী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খোয়াজ পীর কিংবা তোর্ষা পীরের প্রতি ভক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন- তিস্তা নদীর খরা-বন্যাকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে দোতরা বাজিয়ে গান করতে দেখা যায়-

'নদীর বান আসিল রে
ওরে তিস্তা নদীর বান
ঘর গিরস্তী মাইয়া ছাইয়া
ধরিয়া পালান বন্ধু রে'[৩৮]।

অন্যদিকে চরম খরায় বৃষ্টি জন্য 'হুদুম দ্যাও' নামে ব্রত পালন করা হয়,

'ক্ষেতোত নাই ধান আইলোত ধচ্চে মাতাত সেন্দুর
ওরে ধওলা ম্যাঘ কালা ম্যাঘ, দুইঝনে সোদর ভাই
এক চিল্কা পানি দ্যাও এও ধুবার যাই
এও ধুইয়া হ্যার ফেলাই পানি
তায় হইয়া গেইছে হাটু পানি
হাটু পানি নেটু পানি নাও হয়া গেইল পার
কোলার ছাওয়া শোতে থুইয়া ডাঙ্গাও চাইর পহর'[৩৯]।

ফলত আমরা লক্ষ যায়, এই অঞ্চলের তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, ধরলা, গদাইধর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদী উপর নির্ভর করে জন-সমাজে বিশেষ এক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

নদীর উপকূল অঞ্চলে এই ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেলেও নদী থেকে দূরে বসতি সাধারণ মানুষেরও জীবন-জীবিকায় একই দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্রতার পরিচয় লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের রাজবংশী হিন্দু-মুসলিমদের অভিমত অনুসারে, চাষের জমিগুলি বেশিরভাগ দুই থেকে তিন ফসলি হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের তেমন ভাবে ফসলি জমি নেই তাই তাদের দিন মজুরের কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যদিকে বর্ষা কালে ঘন বৃষ্টিপাত হবার কারণে চারিদিকে সবুজে ঘেরা পরিবেশ দেখা যায় এবং স্যাঁতস্যাঁতে হওয়ায় সাধারণত বিষাক্ত সাপের অনুকূল বসতি গড়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় যেমন সাপুরি সম্প্রদায়ের অর্থাৎ বাজিকর জনজাতির আবির্ভাব দেখা যায়। তেমনি সেই বিষাক্ত সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য বহু কবিরাজ আগমন তেমনি বিষহরি বা মনসা ভাসান গানের জনপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। অন্যদিকে নানা সময়ে প্রচণ্ড খরা-বন্যা বা অন্য প্রকৃতিক অভিশাপে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দারিদ্রতা দেখা দেয়। সেই দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে ক্ষণিকের জন্য ভুলে থাকার জন্য প্রান্তিক লোক-সমাজে কুষান, সারি, ষাইটল, ভাওয়াইয়া, জারি প্রভৃতি লোকগানের প্রচলন দেখা যায়। তবে এই গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাওয়াইয়া ও জারি গান অধিক পরিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভাওয়াইয়া গানে লক্ষ করা যায়, প্রান্তিক সমাজের কোনো মানুষ একলা দোতরা সহ বিরহের গান বাধে সেই তীরে বসবাসকারী কোনো রমণীর লাগিয়া। বিখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী আব্বাসউদ্দিন প্রচলিত কথা ও সুরে তার বর্ণনা দিয়েছেন-

‘তিস্তা নদীর পারে পারে রে

মোর জোড়া ঘূণ্টি বাজে

না কান্দিস রে হোকোর ছাওয়া

মৈশাল ছাড়িয়া যাছে রে’[৪০]।

অন্যদিকে সেই প্রেমিক বা স্ত্রী ও গান বাধে-

'তোর্ষা নদীর পারে পারে ও
দিদি লো মানসাই নদীর পারে
আজি সোনার বধূ গান করি যায় ও
দিদি তোর তরে কি মোর তরে
কি শোনেক দিদি ও'[৪১]।

তোর্ষা নদীর শাখা কালজানি নদীর তীরে বিখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী নায়েব আলী টেপু গেয়েছেন-

'আজি নাও চাপাও সুন্দর নাইয়া রে
নাও চাপাও সুন্দর নাইয়া
নাইয়ারে নাও চাপাও চাপাও ঘাটে'[৪২]।

এই ধরনের গানের সংস্কৃতি কোচবিহারে জনমত নির্বিশেষে প্রচলিত থাকলেও জারি গানেরও ভূমিকা অস্বীকার যায় না। বিশেষত মহরমের ঘটনা কেন্দ্রিক একটি গানে তোর্ষা নদীর প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছে-

'পানি খাবা গেলো বাছা তিস্তা নদীর কূলে রে
হায় বাছা সৈয়দ রে
পানি খাইতে বাঘে ধরিয়া খাইতে বাঘে ধরিয়া খালেক রে
হায় বাছা সৈয়দ রে'[৪৩]।

এই গানটিতে শুধুমাত্র তোর্ষা নদীকে উপলক্ষ করে কারবালার ঐতিহাসিক স্থান অর্থাৎ ফোরাদ নদীর কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। এই পরিবেশ পরিস্থিতি জারি গানের বয়াতিরা সাদৃশ্য রেখে গানের আদল তৈরি করছে। অন্যদিকে খণ্ড গান বা দীর্ঘ পালা তারই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

'ওরে কতই দুঃখ দিবি রে দয়াল,
ওরে তুমি আর দুঃখ দিয় তুমি
ওরে আমার সইবার মতো জায়গা দিয়া

আমারে সাগরে ভাসাইও রে’[৪৪]।

এই গানটিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সার্বিক ভাবে লোক-সমাজেরই দুঃখের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে দুঃখ কষ্টের জন্য ঈশ্বরকে অভিযোগ জানানো হয়। অন্য একটি গানে -

‘বনের কুকিল রে তুই বনে যা, কুহু কুহু করে ডাকিস না
ও তোর কুহু কুহু ডাক সোনাইয়া নারীর মন তুই আউলাস না
বনের কুকিল বনে যা কুহু কুহু করে ডাকিস না
কুকিল রে তোর অঙ্গ কালা দেসনা আর আমায় জ্বাল
কুহু কুহু ডাক শুনাইয়া আর জ্বালা তুই জ্বালাস না
বনের কুকিল বনে যা কুহু কুহু করে ডাকিস না
কুকিল রে তোর পায়ে ধরি কান্দিস না রে এমন করি
স্বামী ছাড়া কে বুঝিবে নারী জাতির বেদনা
বনের কুকিল বনে যা কুহু কুহু করে ডাকিস না’[৪৫]।

এই গানটিতে মধ্য দিয়ে দেখা যায়, স্বামী ছাড়া নারীর মনের বেদনা কথা বলা হয়েছে, বনের কোকিলের উপমা দিয়ে। যেখানে ফুটে উঠেছে নারীর মনের বেদনা কথা। বিশেষ ভাবে উল্লেখ যে, জারি গানের মূল বিষয় কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা থেকে প্রান্তিক সমাজের মানুষের মনের বেদনায় তুলে ধরলেও প্রচলিত দীর্ঘ পালাগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে (যদিও সে বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। যে সমাজ জীবনে সামাজিকবদ্ধতা বা বৈষম্য নানা সংস্কার ঘটিত লোকগান এর উদ্ভব ঘটবে এবং সেই গানগুলি লালিত পালিত হবে তা বলাই বাহুল্য। এই অঞ্চলের প্রান্তিক মুসলিমরা বেশিরভাগই সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। বর্তমানে ‘এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ২৫.৫৪% মুসলিম’[৪৬]। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, কেমন করে একটা জন সমাজের জারি গানের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বহুল ভাবে প্রভাব ফেলেছে। ফলত, প্রান্তিক অঞ্চলের মেটো পথে আজও সন্ধ্যা-সকালে জারির সুর ভেসে আসে। এই গানের নায়ক বা নায়িকা ইসলামের ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও এই অঞ্চলের তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, ধরলা, গদাইধর প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য উপকূলে মোষ বা গরু চরিয়ে বেরানো বা দিন মজুরের চরিত্রের ধাঁচে ঢেলে দিয়ে বয়াতিরা প্রতিনিহিত লোক-সমাজের মন জয় করে চলছে।

ঘ. কোচবিহারের মুসলিম সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জারিগান

কোচবিহারে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বহু প্রাচীন। তার সম্যক পরিচয় বাংলার ইতিহাসে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। বাংলার ইতিহাসে উল্লেখিত মুসলিম শাসকরা সাম্রজ্য বিস্তার করতে পারেনি। লক্ষ করা গেছে, ভারতে প্রবল শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের যুগেও-নিরন্তর বহিরাক্রমণকে প্রতিহত করে এখানে হিন্দুরাজ-শক্তি আগা-গোঁড়াই রাজত্ব করে গেছে। যদি আরও পূর্বে ফিরে যাই তাহলে দেখা যায়, 'কাম পীঠ, রত্ন পীঠ, সুবর্ণ পীঠ, সৌমার পীঠ এই চারটি পীঠের মধ্যে এই অঞ্চলটি ছিল সৌমার পীঠের অন্তর্গত'[৪৭]। এই অঞ্চলে 'আনুমানিক অস্ট্রিকরা ৭৫০০ খৃষ্টপূর্বে এসেছিল'[৪৮]। 'এদের শারীরিক গঠন সাধারণ কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায়, চ্যাপ্টামুখ, রক্তচক্ষু হয়ে থাকে। অন্যদিকে ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বে মঙ্গোলীয়দের একটি শাখা তিব্বত হয়ে নেপাল, সিকিম ও ভুটানের পথে উওর-ভারত তথা উওরবঙ্গে প্রবেশ করে। এদের মাথা চওড়া, চোখ ছোট ও ফর্সা হয়ে থাকে'[৪৯]। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ থেকে শুরু করে নানা গ্রন্থে তাদের শরীরের বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই দুই জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকা অনুকূল পরিবেশ লক্ষ করে বসতি স্থাপন করেছিল। ফলে উওরবঙ্গের আদিবাসিন্দারা মেচ, খেন, কোচ, পলিয়াদের সঙ্গে মিশে যান। 'সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কামরূপ ভ্রমন করে যান এবং এই অঞ্চল সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য না দিলেও স্থানীয় অধিবাসিদের শারীরিক বর্ণনা করেছেন এরা কৃষ্ণকায়, খর্বকায়, রুক্ষ স্বভাবের মানুষ। ঐতিহাসিক মিনাজউদ্দিন উল্লেখ করেছেন যে, এখানকার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে কোচ, মেচ, থারু এই তিনটি আদিবাসী বাস করত। ইংরেজ ঐতিহাসিক বুকনন হেমিন্টন পঞ্চদশ শতকের আগে এ অঞ্চলের মানুষকে কোচ, মেচ, খেন বলেই চিহ্নিত করেছেন'[৫০]। 'পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হুসেন শাহ কামরূপ আক্রমণ করলে এই অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তৎকালীন কামরূপ রাজা ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল হয়ে যান। ধারনা করা

যায়, হুসেন শাহ এই অঞ্চল থেকে যাওয়ার পরেই স্থানীয় জৈনিক কোচ সর্দার হারিয়া মন্ডলের পুত্র বিশু সিংহাসনে বসেন'[৫১]। তিনি কোচবংশের প্রাণপুরুষ হিসেবে পরিচিত। তাঁর সময়ে রাজবংশী সমাজের উদ্ভব ঘটে। আজও এই সমাজ সম্পর্কে নানা মিথ প্রচলিত রয়েছে,

'হায় রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।

পরশু রামের ভয় এ বড় সরম

রনে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি

ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি'[৫২]।।

পরবর্তীকালে এই জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ পীর দরবেশের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছেন। এই অঞ্চলে কোন সময় পীর দরবেশের আগমন ঘটে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ তাঁর *কোচবিহার ইতিহাস* গ্রন্থের 'ইসলাম প্রচারক অংশে' লিখেছেন,

> আনুমানিক খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে পশ্চিম কামরূপে ইসলাম ধর্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বহু সাধু সন্ন্যাসী যে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ইসলামের ভক্তিশাস্ত্রে সাধনগণের বিবিধ সম্প্রদায়ের নাম এবং বিবরণ আছে ; প্রথমাবস্থায় যে সকল ইসলাম ধর্মপ্রচারক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাঁদের অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন এবং তাহাঁরা সাধারণত পীর, দরবেশ এবং ফকির বলিয়া অবিহিত হইতেন। সেই সাধুগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পশ্চিম কামরূপে ইসলামের বহুল প্রচার হইয়াছে[৫৩]।

বর্তমানে এই অঞ্চলের পুরনো পীরের দরগা হিসেবে পরিচিত তোর্ষা পীর, শাহ গরীব কামাল, ইসমাইল গাজী, পাগলা পীর, গেয়াসউদ্দিন শাহ সোলতান, সত্যপীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আমরা লক্ষ করছি, এদের আগমন একাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে হয়েছিল। এদের হাত ধরেই কোচবিহারে ইসলাম ধর্ম প্রচার হয়েছিল। অন্যদিকে, এই অঞ্চলে মুসলিম শাসকের আক্রমণ ১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজির তিব্বত অভিযানে মাধ্যমে ঘটে। সেই সময় উওরবঙ্গের পথ প্রদর্শক ছিলেন আদিবাসী দলপতি আলী মেচ। এই আলী মেচ-ই প্রথম কোনো মুসলিম শাসকের হাত ধরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি স্ব-ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন

কিনা সেবিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মীনাজ-ই-সিরাজের *তবকৎ -ই-নাসিরী*তে বখতিয়ারের উত্তরমুখী অভিযানের বর্ণনা পাই-

> কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি লখনৈতিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলির খবর পেলেন এবং তিব্বত ও তুর্কিস্তান দখলের ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রায় দশ হাজার ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী গঠন করেন। তিব্বত ও লখনৌতি রাজ্যের মাঝখানে যে পর্বতমালা রয়েছে, তাতে তিন জাতের মানুষ বাস করে। এক জাতের বলা হয় কোচ, দ্বিতীয়কে মেচ এবং তৃতীয়কে থারু। তাদের সবাইকার চেহারা তুর্কিদের মত, কিন্তু তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে- অনেকটা হিন্দুস্থান ও তিব্বতের ভাষার মাঝামাঝি। কোচ ও মেচ উপজাতিরদের অন্যতম সর্দার আলী মেচ নামে অভিহিত একজন লোক মুহাম্মদ বখতিয়ার দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন; এই লোকটি তাঁকে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চালনা করে নিয়ে যেতে রাজি হল[৫৪]।

উত্তরবঙ্গের একাদশ শতকের পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের লিখিত কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের এই আলী মেচ'কে প্রথম ধর্মান্তরিত মুসলিম বলা চলে। এবিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকরা বলেছেন, 'বখতিয়ার খিলজীর একজন মেচ জাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট হয়েছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত উৎসাহিত হইয়া যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই'[৫৫]। পরবর্তীকালে এই পথ ধরেই কামতাপুরে মুসলিম শাসকদের আগমন ঘটে। এই ঘটনার পূর্বে উত্তরবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, 'সেই সময় বৌদ্ধ মঠ গুলিতে বিদ্যা শিক্ষা চর্চা হত এবং গোরক্ষনাথ, সোনারায়, কানুফা, হারিফা ইত্যাদি তান্ত্রিকের নামও পাওয়া যায়। অন্যদিকে কামতারাজ নীলাম্বর কনৌজ ও মিথিলা থেকে কিছু ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ তাঁদের আমলে আরও কিছু ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। কামতাপুর রাজতন্ত্রের শেষ দিকে শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রমুখ ভক্তিবাদী ধর্ম প্রচারক এসেছিলেন'[৫৬]। বোঝা যায়, এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময় নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের সন্ত বা পীর সাহেবের আগমন ঘটেছিল। কোচবিহার রাজ তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। এদের সাধন পদ্ধতি প্রায় এক এবং পার্থক্য শুধু ঈশ্বর বা আল্লাহ নাম নিয়ে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই একটা জাতপাতের বা বর্ণবৈষম্য মতো সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এমতাবস্থায় বঙ্গের অন্যান্য এলাকার মতো এই

অঞ্চলের সমাজেও ব্রাহ্মণরা ক্ষমতার অধিকারী হন। তারা সমাজের নানা বিধান দিয়ে সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন সময়ে একঘরে করে রাখত। ফলত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ নানা ভাবে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার স্বীকার হয়। অন্যদিকে 'বকতিয়ার খলজি থেকে ঔরঙ্গজেবের সময়কাল পর্যন্ত সতেরো বার কামতা-কোচ রাজ্যে মুসলিম সামরিক অভিযান হয়েছিল'[৫৭]। তারা যেখানে তাবু করত বা যে পথ দিয়ে তারা যেত সেই স্থানগুলির মানুষদের মুসলিম সংস্পর্শজনিত স্পর্শদোষ, জলদোষ ,খাদ্যদোষ ইত্যাদি কারনে সমাজপতিরা সাধারণ মানুষদের নষ্ট আখ্যা দিয়ে একঘরে করে দিত'[৫৮]। তারা সমাজের পিছনের সারিতে বসবাস করত, পেশাগত দিক থেকে তারা কৃষক, জেলে, হাজাম, মাঝি, মুচি, বেদে, জোলা, তাঁতি প্রমুখ। উল্লেখের বিষয়, এমনকি তারা নামের শেষে নষ্ট শব্দটি ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে এই নষ্ট কথাটি নস্য'তে রূপান্তরিত হয়। এমতাবস্থায় এই অঞ্চলে একাদশ শতকে পীরদের আগমন ঘটে এবং তাদের আচার-আচরণ এবং ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, উদারতা দেখে সমাজ বিমুখ সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়। পতিত কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সেই সমাজ বিমুখ মানুষরা (রাজবংশী, মেচ, কোচ, রাভা প্রমুখ সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ) অতি সহজে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে যে ধর্মশূন্য বা সামাজিক মর্যাদাহীন হয়ে থাকত তা এক নতুন ধর্ম গ্রহনের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করে। সেই ধর্মে অর্থাৎ পীর বা হুজুরের ধর্মে কোনো জাতি ভেদ বা বর্ণবৈষম্য এবং শাস্ত্রীয় নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। 'তারা কেহ কেহ স্থানে স্থানে ধাম বা আস্তানার প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন এবং ধর্ম প্রচার করতেন; কিন্তু, তাহাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক পীরই সেই সকল আস্তানায় দেহ বিসর্জন করিয়া তথায় সমাহিত হইয়াছিলেন। 'আস্তানাগুলি সাধারন্তঃ দরগাহ নামে পরিচিত; কিন্তু, সমস্ত দরগাহ সমাধিস্থান নহে। দরগাহ ফারসী শব্দ,-অর্থ দরবার, কাছারী সমাধি। শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন মক্কাশরিফে গমনাগমন সাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর ছিল, সেই সময়ে এতঞ্চলের মুসলমানেরা পাঞ্চতন (গোয়ালপাড়া) পাড়ুয়া (মালদহ জেলা) এবং মহাস্থান (বগুড়া জেলায়) প্রভৃতি স্থানের দরগায় গমন করিতেন'[৫৯]। 'এতদঞ্চলে কতিপয় পীরের জীবনী এবং তাহাঁদের ধর্ম প্রচার বৃত্তান্ত লইয়া অনেক গীত রচিত হইয়াছে এবং পীরগণের আত্মত্যাগ এবং পুতচরিত্র জনসমাজে আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। গীতগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমশ

পরিবর্তিত হইয়া এক্ষণে লোকের শুধু মনরঞ্জনের উপকরণ-এ পরিণত হইয়াছে'[৬০]। ফলে তারা পীর দরবেশের দ্বারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং নামে ব্যবহৃত 'নশ্য পরিবর্তে শেখ শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে, *আমার শিল্পী জীবনের কথা* গ্রন্থে আব্বাসউদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে একটা গুজব উঠে যায় যে, যারা শেখ ব্যবহার করবে তারা শিয়া হয়ে যাবে। ফলত শেখ উপাধি ছেড়ে দিয়ে আলী, উদ্দিন, হোসেন, রহমান ইত্যাদি শরিয়তি নামের দিকে ছুটে আসলেন অনেকে'[৬১]। নস্য শেখ সম্পর্কে বাংলাদেশের 'অনন্যা' প্রকাশিত *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি দ্বিতীয় খণ্ড* পুস্তকে উল্লেখ আছে (বৌদ্ধ বিহার রাজ্যের দলিলে পাওয়া মূল্যবান মন্তব্য), 'By for the shekhe, or as popularty called nashyas. The title nashya is significant here. It means corrupted form of nashya which is fallen or deqenerated'[৬২]। G.F gruinning সাহেবও তার **১৯১১** সালের রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন, 'বস্তুত নস্যরা এখানকার ভূমিপুত্র। এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশীদের সমস্ত চিহ্নই তাদের মধ্যে বিদ্যমান'[৬৩]। ড. বুকানন হ্যামিন্টন-ও মনে করেন যে, 'উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা ধর্মান্তরিত মুসলিম দেশজ মুসলমান। উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমান, মুসলিম শাসকদের বলপ্রয়োগের কারণে এই ধর্মগ্রহণ করেছেন এটি ঠিক নয়, আবার হিন্দুধর্মের ভিতর থেকে তারা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছে এটাও ঠিক নয়। এ অঞ্চলের মুসলমানরা এককভাবে কোনো আগন্তুক জাতি বা সম্প্রদায় নয়। বস্তুত, উত্তরবঙ্গের বর্তমান হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অভিন্ন জৈব উৎস থেকেই উদ্ভূত'[৬৪]।

এই অঞ্চলের মুসলিমরা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে তারা উচ্চতায় মাঝারি ধরনের, শ্যামবর্ণ, চোখ আকার মাঝারি এবং সরল স্বভাবের হয়। যা এই অঞ্চলের রাজবংশী হিন্দু সমাজের মানুষের শারীরিক গঠনের সঙ্গে মিল রয়েছে। তাই প্রাথমিক ভাবে বলা যায়, তারা স্থানীয় রাজবংশী হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহন করছে।

আমরা লক্ষ করেছি, এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাধু-সন্ত বা পীর বা হুজুর সাহেবের আগমন ঘটেছে। যারা নিজেদের আদর্শ প্রচার করেছেন। অন্যদিকে রাজারা

ছিল প্রজা-বাৎসল্য এবং নিজ নিজ ধর্ম পালনের কোনো উল্লেখ বা বাধা ছিল না। কখনই প্রজা বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই স্বাধীন ভাবে পীর সাহেব বা হুজুর সাহেবরা নিজ নিজ ধাম প্রতিষ্ঠা করে সুফি আদর্শ প্রচার করতেন। 'সেই সময় পীরগণ কিছু কিছু জায়গায় আস্তানা বা ধামে এসে সমবেত ভাবে আল্লাহর জিকির (নাম জব) করতেন। পীর সাহেব চলে গেলে তারাও ঘরে ফিরে আসতেন'[৬৫]। পীরের পুরানো বহু ধাম থাকলেও বর্তমানে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে পীর একরামুল সাহেবের ধামের কথা উল্লেখ পাই, 'কোচবিহার শহর সংলগ্ন কাড়িশালে তিনি ৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করে একটি আস্থানা বা খানকা গড়ে তুলেছিলেন'[৬৬]। ফলে বোঝা যায়, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জনসমাজকে সংস্কৃতিক আচার-আচরণের পালনের ক্ষেত্রে বর্তমানে তবলিক জামাতের মৌলবিগণ কঠোর ভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি পালনের বাঁধা দিয়েছে কিন্তু পীর বা হুজুরগণ তেমন কোনো নির্দেশ দিয়ে যায়নি। তাই দেখা যায় তারা নামের শেষে শেখ ব্যবহার না করলেও পীরের আদর্শ থেকে আজও সরে যায়নি। ফলত ইতিহাস এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ শাস্ত্রীয় ইসলাম রীতিনীতি পালন করার পরিবর্তে লোকায়ত ইসলামের ইতিহাসকে জীবনের লক্ষ করে তুলেছেন। আর কালে কালে সেই সমাজ-ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে জারি গান।

ঘ. কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সামাজ-সংস্কৃতিক পটভূমিকায় লোকসঙ্গীত ও জারি গান

বৃহৎ বাংলার পটভূমিকায় কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজ ইসলামিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবগুলি পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নানা সংস্কারমূলক আচার-উৎসব পালন করে চলেছে। অবশ্য সমাজ জীবনে সামাজিকবদ্ধতা বা বৈষম্য এবং নানা সংস্কার পরিত্যাগ করতে পারেনি। ফলে এই সমাজে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের জীবনযাপনের উপর নির্ভর করে একটা অলিখিত জাতিভেদ প্রথা রয়েছে- যা সৈয়দ বা পীর, নশ্য শেখ, ভাটিয়া, বাজিকর, মাছুয়া, প্রামানিক ইত্যাদি উপসম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রধান জনগোষ্ঠী হল নশ্যশেখ। তারা যেমন রাজবংশী ভাষায় কথা বলে তেমনি রাজবংশী সমাজের মতোই গ্রামীণ পটভূমিকায় সংস্কৃতি পালন

করে। আবার এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে সামাজিক ভেদাভেদ। মাছুয়া (মাছ ধরে, জাল তৈরি করে), মুচি, ডোম প্রভৃতি গোষ্ঠীর মুসলিমরা এই সম্প্রদায়ের হলেও সাধারণত তাদের নিম্ন শ্রেনীর মুসলিম মনে করা হয়। তারা রাজবংশী ভাষায় কথা বললেও প্রতিদিন ইসলামিক শব্দ ব্যবহার করে। যেমন গোসল (স্নান), একিন (বিশ্বাস) ,আব্বা(বাবা), আম্মা(মা), ফুফু(পিসি), ভাবি(বৌদি), চাচা(কাকু), দুলাভাই(জামাইবাবু) বুরাবা (ঠাকুরদা), (ঠাকুমা)বুরামা ইত্যাদি ।

এই সমাজে ঈদের উৎসব থেকে শুরু করে পৌষপর্ব পালন সবই প্রতিফলিত হয়। হিন্দু সমাজের মতো রয়েছে বারো মাসে তেরো পার্বণের রীতি। এই সমাজে জারি গান জনপ্রিয় হলেও পাশাপাশি অবসর সময়ে রাজবংশী ভাষায় প্রচলিত ভাওয়াইয়া গান, সারি গান, ছাঁদপেটানো গান, সত্যপীরের গান, মাছ ধরার গান, জাগ গান, কাতিপূজার গান, ষাইটোল গান, বিষহরি বা মনসার গান, দোতরা গান, চারযুগের গান, কুষান গান, মাশান গান প্রভৃতি লোকগান প্রচলিত আছে।

অন্যদিকে কোচবিহারের কোনো কোনো এলাকার মুসলিম মহিলারা এখনো রাজবংশী সমাজের ষাইটল, কাত্যায়নী, হুদুম, সুবচণী প্রভৃতি ব্রত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং এই অঞ্চলের লোকদেবতার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় মাশান। ভয় অথবা কল্যানের জন্য কিছুকিছু মুসলিমকে রাজবংশী সমাজের মানুষের দ্বারা তাদের পূজা দিতে দেখা যায়। এই সমাজে বাংলা মাসের প্রথমদিন থেকে শুরু হয় সামাজিক আচার পালন। বাংলা মাসের প্রথমদিনে নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ, জমিতে ফসল রোপণের সময় গোচলপনা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, ফাল্গুন মাসে তেরো তারিখে বাড়ি'র পশুদের মঙ্গলের জন্য তেরেমেরে, চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুমা প্রভৃতি বাৎসরিক লোকাচার পালন করা হয়। এই সমাজে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি প্রভৃতি খাবারের সঙ্গে কিছু লোকখাবার প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম সিদল, প্যালকা, চালভাজা, মাছ ভর্তা, চ্যাপ্টা চিড়া, সুখাতি, ভাকা পিটা, পোকটাই, হোড়পা, আওটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান ঘিরে রয়েছে নানা আচার পালন। বিয়ের সাত দিন আগে থেকেই শুরু হয় নানা আয়োজন। পাত্রের বাড়ির পক্ষ থেকে পাত্রীর বাড়ীতে গায়ে হলুদের জন্য শাড়ি সহ নানা প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানো হয়। এরপর পাত্রের লজ্জা নিবারণের জন্য প্রদীপ, আঁটিয়া কলা (বিচি কলা), সিঁদুর, কাঁচাহলুদ, সরিষা, তেল,

পান-সুপারি ইত্যাদি দিয়ে চাইলনবাতি তৈরি করে পাত্র অথবা পাত্রিকে মাঝখানে বসিয়ে তার চারদিকে বৈরাতিরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করে। এরপর পাশা খেলে, সিঁদুর খেলে, সিঁদুর তোলার মতো নানা আচার পালন করা হয়। এগুলির পাশাপাশি আকিয়া, খতনা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতিকে ঘিরে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়াও পীর এবং মহরমের অনুষ্ঠানকে ঘিরে রয়েছে আচার পালন। মহরমের উৎসবের পাঁচদিন আগে পাঁচ-পীরের নামে সিন্নি দেওয়া হয়। পাগলা পীর ধামের পাশে থাকে সত্য পীর, কখনো একা আবার কখনও মাশান, কালী, মনসার পাঠের পাশে থাকে। অন্যদিকে পীরের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে মেলা বা উৎসবের আয়োজন করা হয়। যা এই অঞ্চলে ঔরুস বা ওয়াজ বা হুজুরের বা পীরের মেলা নামে পরিচিত। কোচবিহারে পীরের উৎসবগুলির মধ্যে হলদিবাড়ি চিল্কির হাট, টাকাগাছ উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি, ইসলাম ধর্মমতে শাস্ত্রের বাইরে কোনো উৎসব- আনন্দের স্থান নেই। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রান্তিক মুসলিমরা সেই কঠোর আইনকে অতি সহজেই উপেক্ষা করে লোকাচারগুলি আজও পালন করে থাকে।

এই অঞ্চলের প্রান্তিক শ্রমজীবী জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা লোকগানের উদ্ভব ঘটে। সেগুলির মধ্যে জারি গান ছিল অন্যতম। কিন্তু আব্বাসউদ্দিন তাঁর *আমার শিল্পী জীবনের কথা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> গ্রামের অধিকাংশ ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাঁরা রূপান্তরিত হলেন সুন্নি মুসলমানে। কাজেই গান বলতে মর্সিয়া আর মোহররমের বাদ্য গ্রাম থেকে নিল চিরবিদায়'। 'মোহরমের বাজনা সত্যিই গ্রামে বন্ধ হল কিন্তু ভিন গাঁয়ে উঠল কাড়ানাকাড়ি শানাইয়ের বাদ্য। তারা যখন আমাদের গ্রাম-গঞ্জে দলে দলে এসে বাজনা এবং লাঠিসোরাটার খেলা দেখাতে লাগল তখন আমাদের গ্রামের যুবকরা যারা সমাজের ভয়ে দল ভেঙেছিল তারাও লুকিয়ে গিয়ে ডম্প (এক ধরনের ঢোল বাদ্য বিশেষ) নিয়ে দলের সাথে ভিড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের আশেপাশে প্রায় দশ বারোখানা গ্রামের মোহররমের দল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি থেকে প্রায় দুই তিন মাইল দূরে সত্যপীরের গান শুনতে গেলাম একদিন। সেখানে সেই দলের মুলে গায়েন গেয়ে উঠল,
>
> ও ভাই আল্লা বলরে রসুলের ভাবনা

দিনে দিনে হইল ফারাজি সিন্নি খাওয়া মানা ।।

অবশ্য এ গান শুনেছিলাম মোহররম উপলক্ষ্যে[৬৭]।

এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, কোচবিহারের মুসলিমরা বিংশ শতকের গোড়ার দিকে শিয়া মতাদর্শের বিশ্বাসী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তারা বিশ্বের অন্যান্য শিয়া মুসলিমদের মতো সেইসময় মহরমের আচার পালন করত। ঘটনাচক্রে তারা শিয়া থেকে সুন্নিপন্থীতে পরিবর্তিত হন। কিন্তু এই পরিবর্তন কেবলমাত্র আব্বাসউদ্দিন যে স্থানে বসবাস করতেন তার পাশের দশ-বারোটি গ্রামেই হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র কোচবিহারের মুসলিম সমাজে উক্ত প্রভাব পরেনি। এ কথা সত্য যে, যারা শিয়া থেকে সুন্নিতে রূপান্তরিত হলেন তাদের মধ্যেও দীর্ঘ দিনের মহরমের আচার পালনের সংস্কৃতি অতি সহজে ভুলতে পারেনি। কারণ আমরা লক্ষ করেছি, এই অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠী মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হলেও আজও পূর্বপুরুষের লোকসংস্কৃতি পালন করছে, এমনকি তাদের রাজবংশী মুসলিম অর্থাৎ কোচবিহারী মুসলিম বলা হয়। ‘স্থানীয় অধিবাসীরা কোচবিহারী নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম নয়’[৬৮]। সেইসূত্রে বলা যায়, তারা মতাদর্শ বদল করলেও তাদের মধ্যে কিন্তু সেই পূর্ব আচার অর্থাৎ মহরম পালনের আচার থাকার কথা। তাই দেখা যায়, মহরমের উৎসব এবং জারি গান বিলুপ্ত হওয়া তো দূরের কথা বরং এই মহরমকে ঘিরে নতুন আচারের উৎপত্তি ঘটেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, হরিণচওড়ায় মহরমের উৎসব পালনের ঘটনা। এমনকি বর্তমান সময়ে শিয়া-সুন্নি মতভেদকে অমান্য করে, নিজস্ব ভাবে প্রতিবছরেই মহরম আচার-অনুষ্ঠান এবং জারি গান উপভোগ করছে। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মুসলিম লেখক বজলে রহমান সাহেব এ বিষয়ে বলেছেন, ‘ইসলামিক ধর্মের শরিয়তি কঠোরতা তারা এড়িয়ে চলেন এবং পীর-দরবেশদের মান্য করেন। স্থানীয় ভাওয়াইয়া, দোতরাডাঙ্গা, কুষাণযাত্রা, জারিগান, বিয়ের গীত ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। মহরমের তাজিয়া নিয়ে হৈ হুল্লোড় করা, ঢাক বাজানো, লাঠি খেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ লক্ষ করার মতো’[৬৯]। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই অঞ্চলে মুসলিমরা আজও নিজস্ব ভাবে (বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিনহাটা, হলদিবাড়ী, পেটলা, বড়মড়িচা, হরিনচওড়া) মহরম পালন করে। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর পালনের আচার ও বদলে গেছে। সে বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে দেখা গেছে বিংশ শতকের

গোঁড়ায় যারা মহরমের জারি গান করত তাদের খুবেই অল্প সংখ্যক মানুষ স্থানীয় সত্যপীরের গান, ভাওয়াইয়া, বিষহরী বা কুশান প্রভৃতি লোকগানের দলে অংশ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিনের জারির সুরেই লোকগানগুলি গীত হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। ফলে জারি গানের একটি নতুন অধ্যায় সূচনা হয়েছে। (এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মহরমের দিন খণ্ড খণ্ড ভাবে জারি গান করা হত। এবিষয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট প্রবীণ জারি বয়াতি আহম্মদ আলী জানান- ‘আমরা সাধারণত দিনের বেলা গান করলেও অধিকাংশ সময় রাত্রিতে জারি গান করি। গান শেষ হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষ গান বন্ধ করতে দিত না এবং বলতেন- আর একটু বলেন, আর একটু বলেন। আমি তখন কেবল গান শিখছি’[৭০]। এই ভাবনার প্রান্তিক অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের মনের অব্যক্ত দুঃখ যন্ত্রনার জায়গা থেকে উদ্ভব ঘটেছে। যে কষ্ট-দুঃখ তাদের অন্তরে ছিল তা গানের সুরের মাধ্যমে সমরূপ বিষাদ লক্ষ করে চোখের জলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে এক ধরনের শান্তি পেত। যা সমকালীন স্থানীয় অন্য কোনো লোকগানে সেই স্বাদ ছিল না। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জারি গানের সুরে ,ছন্দে, বর্ণনায় এবং অনেকটা বদল ঘটেছে। জারি গানের বিষয় ইসলামিক কারবালার ঐতিহাসিক বিষাদের ঘটনা নির্ভর হলেও দেখা যায়, বয়াতিরা যখন এই অঞ্চলের প্রচলিত লোকগানের ভাবনা গানের নানা কথা এবং নানা দুঃখ দুর্দশার চালচিত্রের মিশ্রণে গান করেন, তখন এই অঞ্চলের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

কোচবিহারে মুসলিম সমাজে জারি গান সারা বছরেই কমবেশি শোনা যায়। প্রখ্যাত লোকসাহিত্য সমালোচক রত্না রশীদ এই গানের সম্পর্কে বলেছেন- ‘তিনটি ভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে জারি-জঙ-মোর্শিয়া। জারি শোক বেশি (বাদ্যযন্ত্র থাকে না), মোর্শিয়া শোক কম, জঙ মার্চিং সং– এর মতো সুরে গাওয়া হয়’[৭১] । কবি জসীম উদ্দিন তাঁর *জারিগান* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ‘জারিগানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র থাকে’[৭২]। অন্যদিকে উমেশ শর্মা *মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া* গ্রন্থে বলেছেন, ‘উত্তরবঙ্গে জারিগান পুরুষেরা করে না। মুসলিম মহিলারাই এ গান করে থাকেন’[৭৩]। তিনি ঠিক কোন অর্থে বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। এতদিন এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জেনে এসেছে পুরুষরাই জারি গান করেন। কখনোই নারী সমাজ এই

গানের বয়াতি হিসেবে দেখা যায়নি। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এগুলির আলাদা ভাবে মূল্যায়ন ঠিক হবে না বলে ধারনা করা যায়।

কোচবিহারের জারি গানের প্রত্যেক দলের শিল্পীর সংখ্যা পাঁচ থেকে সাতজন সদস্য থাকে। সাধারণত দলগুলি মামা-ভাগিনা, নানা-নাতি প্রমুখ নামে পরিচিত। প্রত্যেক দলে একজন করে হিন্দু শিল্পী থাকে, যিনি ঢোল বা সরাজ বাজান। বয়াতি শরীরে পাঞ্জাবী পরিধান করে। গানের সঙ্গে ঢোল, কেঁচিও, ঝুরি, দোতরা বা সরাজ প্রভৃতি লোকবাদ্য বাজানো হয়। গ্রামাঞ্চলের সকল স্তরের মানুষ এই গান উপভোগ করতে পারে তাই সন্ধ্যার পরেই গান শুরু করে। উল্লেখ্য যে, গান শুরু করার সময় আল্লাহ, মহানবী হজরত মহাম্মদ, ফাতেমা–আলী, হাসান-হোসেন, পীর সাহেব, গানের গুরুদেব, পিতা-মাতা নামে বন্দনার রীতি পালন করা হয়। বয়াতিরা গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে নেচে কাহিনি পাঠ করে। গানের বিষয়কে তিন অথবা চারটি পর্বে ভাগ করে তিন বা চারজন মিলে পাঠ করে। এই ধরনের গান শোনার পর প্রত্যেকটি দর্শক এক বিষাদ নিয়ে বাড়ি যান। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় এই গানের জনপ্রিয়তা বেশি দেখা যায়। প্রান্তিক এলাকায় কখনো কখনো চাঁদা তুলে এই গানের ব্যবস্থা করা হয়। গানের এতই জনপ্রিয়তা যে, অনেক সময় হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত ভাবে এই গানের আয়োজন করতে হয়। এ অঞ্চলে জনপ্রিয় বয়াতি মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য- আহাম্মদ আলী (ট্যাবলেট মুন্সি) আমিনুল ইসলাম, আয়নাল মিয়া, মমিনুল মিয়া, কপির হোসেন, জনাব আলী, আব্দুল কবি, গফুর আলী, নবাব মিয়া, সফিকুল মিয়া, প্রমুখ। প্রত্যেক বয়াতি মধ্যে সুরে ,ছন্দে, বর্ণনায় নিজস্ব স্বতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে প্রান্তিক মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন ধরে ইসলামিক ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারি গান প্রচলিত রয়েছে। যেমন শহীদ কারবালার, মোসলেম পালা, ইসমাইলের কুরবানি, আইব নবী জীবনী, কুলসুমের মেছবানি, ধনীর ছেলে দুলালের কাহিনি, হজরত বেলালের জীবনী, জাবেরের দাওয়াত, আবুমুসা জঙ্গি, প্রভৃতি কাহিনি সঙ্গে সামাজিক, নবীতত্ত্ব, বন্দনা, মনোরঞ্জন, তত্ত্বমূলক প্রভৃতি গানের সংযুক্ত হয়ে জারি গানের আদল গড়ে উঠেলেও আজও কারবালার কাহিনিই এই গানের মূল বিষয় হিসেবে ধরা হয়।

আমরা জানি, ইসলাম ধর্ম মতে, শাস্ত্রের বাইরের তেমন ভাবে কোনো উৎসব-আনন্দের স্থান নেই। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রান্তিক মুসলিমরা সেই কঠোর আইনকে অতি

সহজেই উপেক্ষা করে জারি গানের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। বয়াতিরা গান শুরু করার সময় মুসলমান সম্প্রদায়কে সালাম এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে নমস্কার জানান। তাছাড়া যখন গানের শিল্পী হিসেবে একজন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক থাকেন এবং গানের শ্রোতা হিসেবে সকল সমাজের মানুষ উপস্থিত থাকেন তখন প্রান্তিক মুসলিম সমাজের গানের পরিচয় গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র প্রান্তিক সমাজের লোকগানে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র:

১) ইসলাম, ড. আমিনুল, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বৈশাখ ১৪১৯ পৃ ১০৩

২) তদেব, পৃ ১০৪

৩) আহমেদ, ওয়াকিল, *জারি গান*, বইপত্র ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৯ ,পৃ ১০

৪) তদেব,পৃ ১০

৫) তদেব, পৃ ১০

৬) তদেব, পৃ ১১

৭) মল্লিক, হাসির, *মুসলমান আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব*, বটতলা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃ ১২৮

৮) আহমেদ, ওয়াকিল, *জারি গান*, বইপত্র ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৯, পৃ ১৩

৯) সিদ্দিকী, মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ, *মুসলিম উৎসব ঐতিহ্য,* বাতায়ন প্রকাশক ,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯ পৃ ৮৮

১০) আহমেদ, ওয়াকিল, *জারি গান,* বইপত্র ৩৮/২ক বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৪১৯, পৃ ১৩

১১) তদেব, পৃ ১৪

১২) সিদ্দিকী, মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ, *মুসলিম উৎসব ঐতিহ্য,* বাতায়ন প্রকাশক ,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯, পৃ ২৫৬

১৩) তদেব,পৃ ২৫৬

১৪) তদেব,পৃ ৮৭

১৫) তদেব ,পৃ ২৫৭

১৬) তদেব, পৃ ৮৯

১৭) তদেব, পৃ ২৫৯

১৮) উদ্‌দীন, জসীম, *জারীগান,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, পৃ ৫

১৯) হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল, *বঙ্গে স্বুফী –প্রভাব,* র‍্যামন পাবলিশার্স, বাংলা বাজার ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রন ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ,পৃ ১৪৮

২০) মল্লিক, পার্থ প্রতিম (সম্পাদিত), *সৃজনী ধারা,* জলপাইগুড়ি, গোমস্তাপাড়া, বিশেষ সংখ্যা ১৪১৯, পৃ ২৮

২১) তদেব, পৃ ২৯

২২) তদেব, পৃ ২৯

২৩) মল্লিক, হাসির, *মুসলমান আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব,* বটতলা, কলকাতা ৭০, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃ ৮

২৪) চৌধারী, ড. দুলাল, *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* আকাদেমি অব ফোকলোর , কলকাতা ৯৪, প্রথম প্রকাশ ২০০৪ সাল, পৃ ১৫১

২৫) শর্মা, উমেশ, *মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ২০০৫, পৃ ৬৪

২৬) আহমেদ, ওয়াকিল, *জারি গান,* বইপত্র ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৯, পৃ ১৬

২৭) তদেব, পৃ ১৬

২৮) তদেব, পৃ ১৬

২৯) উদ্‌দীন, জসীম, *জারীগান,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, পৃ ৭

৩০) রশীদ, রত্না, *জারি-জঙ-মোর্শিয়া,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮,পৃ ২৭

৩১)https://www.youtube.com/watch?v=eDAm1FD_oLE&list=PLFoHP4oe8mZI0LbmugFY5MFPd_GUdMH8p

৩২) শর্মা, উমেশ, *মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা ৫০, প্রকাশ ২০০৫, পৃ ৬৬

৩৩) তদেব, পৃ ৬৭

৩৪) তদেব, পৃ ৭১

৩৫) তদেব, পৃ ৭৬

৩৬) তদেব, পৃ ৮০

৩৭) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদিত), *উত্তর প্রসঙ্গ,* দিনহাটা সংখ্যা ১ম খণ্ড, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০১৬, পৃ ২

৩৮) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদক), *উত্তর প্রসঙ্গ,* উত্তরবঙ্গের নদীকথা ১ম খণ্ড , উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০১৮, পৃ ৮৪

৩৯) তদেব, পৃ ৮৬

৪০) তদেব, পৃ ১৯১

৪১) তদেব, পৃ ১৩০

৪২) তদেব, পৃ ১৬৯

৪৩) তদেব, পৃ ১৯১

৪৪) সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ- ১৩ নভেম্বর ২০১৮, সময়- বিকাল ০৪.২০ মিনিট

৪৫) সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান-কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ- ১৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪.২০ মিনিট

৪৬)https://www.google.com/search?q=Koch+Bihar+religion-wise+data+2011&oq=Koch+Bihar+religion-wise+data+2011&aqs=chrome..69i57.4043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

৪৭) হোসেন, আমজাত, *কামরূপ থেকে কোচবিহার*, সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, ২০১৪, পৃ ৬৫

৪৮) দাস, সুকুমার, *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস*, কুমার সাহিত্য প্রকাশক, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ ১৬

৪৯) রহমান, বজলে, *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ*, শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশসন, কোচবিহার , প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৮, পৃ ১৩

৫০) তদেব, পৃ ১৪

৫১) হোসেন, আমজাত, *কামরূপ থেকে কোচবিহার*, সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, ২০১৪, পৃ ৬৫

৫২) ভৌমিক, নির্মলেন্দু, *প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত*-অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ ২৭

৫৩) আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *কোচবিহারের ইতিহাস প্রথম খণ্ড,* মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, পৃ ১৫৮

৫৪) মল্লিক, পার্থ প্রতিম (সম্পাদিত), *সৃজনী ধারা,* জলপাইগুড়ি, গোমস্তাপাড়া, বিশেষ সংখ্যা ১৪১৯, পৃ ২৯

৫৫) তদেব, পৃ ২৮

৫৬) রহমান, বজলে, *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ,* শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশসন, কোচবিহার, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৮, পৃ ১৪

৫৭) তদেব, পৃ ২২

৫৮) তদেব, পৃ ৪৪

৫৯) আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *কোচবিহারের ইতিহাস প্রথম খণ্ড,* মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, পৃ ৬৬

৬০) তদেব, পৃ ৬৬

৬১) মল্লিক, পার্থ প্রতিম (সম্পাদিত), *সৃজনী ধারা,* বিশেষ সংখ্যা- উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি, জলপাইগুড়ি, গোমস্তাপাড়া, বিশেষ সংখ্যা ১৪১৯, পৃ ৬৫

৬২) তদেব, পৃ ৬৮

৬৩) তদেব, পৃ ৪৩

৬৪) তদেব, পৃ ৩০

৬৫) রহমান, বজলে, *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ,* শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশসন, কোচবিহার, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৮, পৃ ৪৫

৬৬) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদিত), *উত্তরপ্রসঙ্গ,* হুজুর সাহেব সংখ্যা, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০০৯, পৃ ৪৪

৬৭) উদ্দিন, আব্বাস, *আমার শিল্পী জীবনের কথা,* সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ ৯

৬৮) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদিত), *উত্তরপ্রসঙ্গ,* উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০১১, পৃ ৭

৬৯) হোসেন, আমজাত, *কামরূপ থেকে কোচবিহার,* সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, ২০১৪, পৃ ১২১

৭০) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর-চামতা,তারিখ-২২ নবেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩.২৩ মিনিট

৭১) রশীদ, রত্না, *জারি-জঙ-মোর্শিয়া,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ৬৩

৭২) উদ্‌দীন, জসীম, *জারীগান,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, পৃ ৬

৭৩) শর্মা, উমেশ, *মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কল ৫০, প্রকাশ ২০০৫, পৃ ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: কোচবিহার জেলার প্রান্তিক মুসলিম সমাজের জারি গানে ঐতিহ্যের নানা প্রেক্ষিত

আমরা জানি, লোক-সমাজে সংস্কৃতির নানা অঙ্গ মিশে থাকে। সেগুলি তাদের কোনো না কোনো ভাবে ঐতিহ্য বহন করে। কোচবিহারের মুসলিম সমাজে প্রচলিত জারি গানও প্রান্তিক সমাজের এক অনন্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দাবী রাখে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন এই গানের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে তেমনি জনপ্রিয়তাও কোনো অংশে কমে যায়নি। এই গানের জন্য বয়াতিদের বিভিন্ন সময় মৌলবিদের সঙ্গে বিবাদও ঘটেছে। তারা এই গানের মাধ্যমে একটা জগৎ খুঁজে পান, যেখান থেকে তাঁরা কখনো বিচ্ছিন্ন হতে চান না।

ক. জারি গানের সঙ্গে বয়াতি বা কবিদের সম্পর্ক

এই অঞ্চলে যারা জারি গান করেন অর্থাৎ যাদের মুখে এই গান গীত হয়ে থাকে, সাধারণত তাঁদের বয়াতি বলা হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলে যারা জারি গান করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আহাম্মদ আলী (ট্যাবলেট মুন্সি), আমিনুল ইসলাম,

আয়নাল মিয়া, মমিনুল মিয়া, জনাব আলী, কপির হোসেন, আব্দুল কবি, গফুর আলী, সিদ্দিক হোসেন, জলিল হোসেন, সফিকুল মিয়া প্রমুখ। প্রত্যেক বয়াতির মধ্যে সুরে, ছন্দে, বর্ণনায় নিজস্ব স্বাতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়। বিশেষত এদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন আহাম্মদ আলী (ট্যাবলেট মুন্সি), আমিনুল ইসলাম, আয়নাল মিয়া প্রমুখ।

১. আহাম্মদ আলী

প্রথমে এই অঞ্চলের জারি গানের কথা বলতে হলে আহাম্মদ আলির (ট্যাবলেট মুন্সি) কথা বলতে হয়। বর্তমানে তাকে এই অঞ্চলের লোক-সমাজ জারি গানের গুরু বা সম্রাট বলে আখ্যা দেয়। তিনি স্থানীয় মাদ্রাসা এবং কিছুদিন বাংলা মাধ্যমের পড়াশুনা করলেও দারিদ্রের কারণে বাল্যকালেই তথাকথিত প্রথাগত পুঁথি শিক্ষায় ইতি ঘটে। কিছুদিনের মধ্যে এক বাউলের (গফুর আলী বাউল) সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন লোকগানের জগতে। তাঁর কাছে আট বছর থাকার পর বাউল তথ্য এবং বাউল গান সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পর পূর্ব বাংলার কাচু ফকিরের কাছে ফকিরি গান শিখিতে শুরু করেন। সেই সময় তিনি পূর্ব বাংলার যশহর, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। অন্যদিকে তাঁর কাছে ইসলামিক নানা ঐতিহাসিক ঘটনা গল্প আকারেও শোনেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থানকালে এক গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে তিনি জীবনের প্রথম গান রচিত করেন-

কলিরও ভোরবেলা ময়মনসিংহ জেলা, লুঠ হল গ্রাম সাত খানা
কালিবাবুর একখানা বাড়ি বাইসখানা ঘর তার সারি সারি
আগুন দিয়ে সবে গেল, কেউ তো দেখিতে আসিল ছিল
ওই দেশেতে অমন বাড়ি যে একখানাও ছিল না
বোলপুরের হাজতে নয়শো আসামী, ছয়শো তার সাক্ষী
কেউ তো রক্ষা পেল ......
কলিরও ভোরবেলা ময়মনসিংহ জেলা, লুঠ হল গ্রাম সাত খানা[১]।

এরপর পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে আসেন নিজ মাতৃভূমিতে। কিছুদিনের মধ্যে সুফি মাহাবুল আলম চিশতীর কাছে মুরিত হন এবং তার কাছে সুফি দর্শনের তত্ত্ব লাভ

করেন। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর সংসার জীবনের প্রতি মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে যায় এবং বাইরের জগতের চাইতে আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে বেশি ভাবতে শুরু করেন। এমনকি সুফিবাদ জানার জন্য আসামের পীরসাহেব নাছরুদ্দিনের কাছে কিছুদিন ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার ফকির সম্প্রদায় এবং মাইঝভাণ্ডারী হাবিব বসার এবং সফিউল বসারের সঙ্গেও কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। এরপর বৈষ্ণবধর্ম জানার জন্য কেশব ভারতীর গোঁসাই (সন্ন্যাসী) এর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর কাছে এক বছর থাকার পর বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এমনকি তিনি মেখলিগঞ্জ থেকে গোলাপাড়ার তেরোটা মন্দিরে ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে’ বলে নামকীর্তন করেন। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে তিনি বহু বৈষ্ণব ভক্তের বাড়িতে যায়। এইভাবে সুফি, বাউল, বৈষ্ণব দর্শনের নানা জ্ঞান অর্জন করার পরেই তিনি জারি গান শেখার জন্য স্থানীয় খালেক মিয়া এবং খয়বার মিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জারি গান শেখার কারণে মুসলিম গোঁড়াপন্থী সমাজ তাকে একঘরে করে রাখে। সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সেই বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি নিজস্ব জারি গানের দল গঠন করেন। তখন তাঁর বয়স তিরিশ। গানের সূত্রে চান্দামারিতে সুশীল বাউল এবং দিনহাটার নিমাই সর্দার এর সঙ্গে বৈষ্ণব মতাদর্শ নিয়ে তর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত তার কাছে হার স্বীকার করেন। অন্যদিকে তাকে বিভিন্ন স্থানে গোঁড়া মৌলবাদীদের অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল। বিশেষত, নাগকাটিতে মওলানা আকবর আলী তাঁর নামে অভিযোগ করে ইসলাম ধর্ম বিকৃত করে তিনি জারি গান করছেন। এমনকি দিনহাটা থানায় ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তার নামে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু সেই থানার হরেন পুলিশ পূর্বে তাঁর বহুবার জারি গান শুনে ছিলেন। সেইসূত্রে তিনি তাদের দেওয়া অভিযোগ বাতিল করে দেন। তারপরও গোঁড়া মৌলবাদী দল সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করেন, আহাম্মদ আলীর জারি গান ইসলাম বিরোধী। তিনি সেই সময় আসামের পীর নাসিরুদ্দিনের কাছে জারি গানের স্বপক্ষে তাঁর মন্তব্য লিখে আনেন এবং তা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচার করেন। তারপরও মাথাভাঙ্গার কচুবারিতে জারি গান করার সময় কিছু মৌলবাদী তাকে বাঁধা দিলেও আঞ্জুর মিয়া ও মজিবর মিয়া (বিশিষ্ট মুসলিম মৌলবাদী নেতা) তাকে গান করার বাধা থেকে নিস্তার করেন। এরপর দিনহাটার মুসলিম সমাজ তাকে মহরম উৎসবের সেক্রেটারি করেন। সেখানে মহরমের

উৎসবের দিন জারি গান করেন। তাঁর ৬৫ বছরের জীবৎকালে কাছে বহু লোক জারি গান শিখেছেন এবং এমনকি আলাদা জারি গানের দল গঠন করেছেন। বছরের বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকেন না হয়ত মাসে একবার বাড়ি ফেরেন। তিনি দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে গান করেন। বর্তমানে তাঁর দলের নাম 'মামা- ভাগিনা' সম্প্রদায়ের জারি গান। তাঁর দলের সদস্য সংখ্যা ছয়জন। উল্লেখ্য- বয়াতিদের মধ্যে তিনি নিজে, মমিনুল মিয়া ও সফিকুল মিয়া, কেসিও বাদক সাকির মিয়া, সরাজ বাদক এবং ধুয়া বয়াতি কৃষ্ণ বর্মণ প্রমুখ। তবে তাঁর বয়স বেড়ে যাওয়ায় মমিদুল মিয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্র সফিকুল মিয়া পালার বেশিরভাগ অংশ গীত পরিবেশন করে। তবে তিনি প্রত্যেকটি পালায় যেমন উপস্থিত থাকেন তেমনি শেষের দিকেও কিছু সময়ের জন্য গান করে থাকেন। তাঁর কাছে জারি গানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, আয়নাল মিয়া, মমিনুল মিয়া, জনাব আলী, আব্দুল কবি, গফুর আলী প্রমুখ।

২. আয়নাল মিয়া

প্রথমদিকে তিনি জারি গানের দোতরা বা সরাজ বাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে আহাম্মদ মিয়া এবং খালেক মিয়ার কাছে জারি গানের শিখেছিলেন। তাঁর জীবনও চরম দারিদ্রতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন বছর। দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে এই গান-ই তাঁর জীবন সঙ্গী। তাঁর প্রধান পেশা-ই জারি গান। তিনি বলেছেন, বর্তমানে মানুষের হাতে সময় কমে গেছে তাই আর সারারাত ধরে গান করা হয় না- তিন থেকে চার ঘণ্টা করা হয়। গানের মধ্যে যেমন দুঃখের গল্প তুলে ধরা হয় তেমনি সামাজিক শিক্ষা, জ্ঞানের কথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উল্লেখ করা হয়। তিনি আরও বলেন, এই গানের মধ্যে ভাওয়াইয়া, পালাগান, ফকিরী, মুর্শিদি, মারফতি, ভাটিয়ালী গানের রস খুঁজে যায়, তাই এখনও গানের জনপ্রিয়তা বজায় রয়েছে। মৌলবীরা আজও এই গানকে মান্যতা দেন না কারণ সমাজের বাস্তবতার কথা তুলে ধরা হয়। তবে এই গানের সুর অনেকটা ভাটিয়ালী। তা না হলে গানের সুর মিষ্টি হবে না। এই গানের প্রতি মানুষের এতই টান ছিল যে দিনের পর দিন জমিদার রা গীদালদের বাড়িতে রেখে গান শুনতেন। এমনকি এই গানের জন্য বহু মানুষ জমিদার

থেকে ফকির হয়ে গেছে। ময়মনসিংহ বা ফরিতপুরের ভাষায় এই গান করা হয়। তাঁর ভাগিনার নাম সহিদ্দুলা মিয়া, কেসিও বাজান আব্দুল মজিত মিয়া, ঢোল বাদক মলয় কিঙ্কর। এই গানের জন্য গোঁড়া মৌলবীদের নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। এমনকি তাঁদের হাতে বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক প্রহার সহ্য করতে হয়েছিল। এবিষয়ে তিনি যুক্তি দেন, সুর দিয়ে আজান দেওয়া হয়, *কোরান* পড়া হয়, সুর দিয়ে মিলাত পাঠ করা হয় তাহলে সুরকে কেন হারাম বলা হয়। সেই উত্তর আজও তাকে মৌলবীরা দিতে পারেনি। তবে যাই হোক, জারি গান যে ব্যক্তি শুনবে তারই চোখে আসবে- একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

৩. আমিনুল মিয়া

সীমান্ত পার্শ্ববর্তী জারি গায়ক আমিনুল মিয়া। তাঁর বর্ণিত দারিদ্রের জীবন কাহিনি থেকে জানা যায়, তিনি মোক্তার আলির কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জারি গান শিখেছেন। তাঁর গুরুর বাড়ি বাংলাদেশের ছিটমহল কাশিয়ার ছড়া। প্রথম গান করতেন একশো থেকে দেড়শ টাকায়। এই গান তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পরিবেশন করছে। এটাই তাঁর জীবনে প্রধান পেশা। তাঁর জারি গানের দলের নাম ‘মামা-ভাগিনা’ সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বর্তমানে তাঁর দলে সদস্য সংখ্যা ছয়জন। তপন কিন্নর ঢোলক, খোরসেদ আলী, আইনুল হক, অমিদুল হক, তাঁর সহযোগী গায়ক এবং ভাগিনার কপির হোসেন প্রমুখ। এই গানে মূলত ইসলামিক পূর্ব-পুরুষের জীবন কাহিনি বর্ণনীয় ঢঙে পরিবেশিত হয়। গানের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছেন- হিন্দু-মুসলিম এক সঙ্গে চলতে পারে তার জন্য করা হয়। আশা করা যায়, গানের মধ্যে জ্ঞানের কথা এবং বিষাদের কাহিনিগুলি শোনার ফলে সমাজে কোন না কোন পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু গানে বাজনা থাকার কারনে শরীয়তী মুসলিমদের কাছে আজও বেদাত হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে লক্ষ করা গেছে, হিন্দু-মুসলিম অনেক সময় যৌথ ভাবে আয়োজন করে। এই গানের উৎস বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় হলেও বর্তমানে কোচবিহারের জারি গান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত্ব

অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পূর্বে বহু মানুষ বাংলাদেশ থেকে জারি গান করতে আসলেও এখন আর আসেন না।

৪. কপির হোসেন

তিনি কোচবিহার জেলার গোবরাছড়া অঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁর বর্ণিত জীবন কাহিনি থেকে জানা যায়, বাল্যকাল চরম দারিদ্রতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। গ্রামীণ জমিতে শ্রমিকের কর্ম করে পরিবারের চাহিদা মেটালেও সেই নুন্যতম বয়সে তিনি শ্রমিকের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং বয়স কম হওয়ায় তাকে অনেক সময় কাজে না নেওয়ার ফলে তাঁর পরিবারের দারিদ্রতাকে আরও চরম সীমায় ঠেলে দেয়। সেই অবস্থায় উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি কবি গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মোকার আলী এবং মামা আমিনুল মিয়ার কাছে জারি গান শেখেন। তিনি জারি গানের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছেন, জারি গান শুধু মুসলিম ধর্ম গান শুধু নয় এটা কোচবিহার অধিবাসীরও গান। মূলত এই গানে, সকল সম্প্রদায়ের শ্রোতায় উপস্থিত লক্ষ করা যায়। এটা মূলত দুঃখের গান। মানুষ এই কাহিনিগুলির মধ্যে নিজেদের দুঃখের উপশম খুঁজে পান। যদিও গানের মাঝে মাঝে সমাজের বাস্তব কথা তুলে ধরা হয় বলে তারপরেও গোঁড়াপন্থী মুসলিমরা এই গান গ্রহণ করেন না।

এই চারজনের মতোই মমিদুল মিয়া, সিদ্দিক মিয়া, আব্দুল কবি, গফুর আলী, সিদ্দিক হোসেন, জলিল হোসেন, সফিকুল মিয়া প্রমুখ বয়াতিদের জীবন দুঃখ-কষ্টের ঘটনা উপস্থিত রয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত চারজনের মতোই তাদেরও রয়েছে জারি গানের প্রতি রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা এবং জারি গান তাদের জীবনের মূল পেশা।

এই অঞ্চলের জারি গানের বয়াতিরা নিতান্ত দারিদ্র বা দারিদ্রের সীমার নিচে সমাজে বসবাস করে এবং তাদের বেশির ভাগ সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এলাকার বসবাস করেন। প্রত্যেকের পুঁথিগত শিক্ষা তেমন ভাবে নেই বললেই চলে। বয়াতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও মৌখিক প্রথার মাধ্যমে গুরুর কাছে গান শেখার আচার রয়েছে। যা

লোকগানের প্রাচীন ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাগিনা প্রধান গায়কের সহযোগী হিসেবে থাকেন। মূল গায়ক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে কাহিনি বা ঘটনা বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য গায়করা সহযোগী হিসেবে ধুয়া ধরেন। গানে বাদ্য বাজিয়া গানের তাল ও সুর রক্ষা করা হয়। মাঝে মাঝে বয়াতি একা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচ পরিবেশন করে। গানের ভাব অনুসারে নাচের ভঙ্গিমা দ্বারা বিরহের চিত্র ফুটে ওঠে। দোতরা অথবা সরাজ বাজিয়ে যেমন গানের গতি ভঙ্গি পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়, তেমনি কোথায়ও কোথাও ঢোল অথবা খঞ্জনী দিয়ে গানের তাল সৃষ্টি করা হয়। মূলত গানের জন্য মঞ্চের ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও বেশির ভাগ বাড়ির আঙ্গিনা বা খোলানে গানের আয়োজন করা হয়। মাঝে মাঝে সামাজিক ও তত্ত্বমূলক গানের মাধ্যমে গানের ধুয়া ধরা হয়। আবার অনেক সময় গানের মাঝে মাঝে গল্প আকারেও বলা হয়। এই গুলি মূল গানের বিষয় না হলেও মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিষাদের সুর আরও করুন আবহ তৈরি করে। অন্যদিকে বিষাদের কাহিনি নৃত্য-সঙ্গীত যোগে পরিবেশিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মনে একটা বিরহের ভাব সৃষ্টি হয়। বর্তমানে গানের অনেকখানি বিস্তার লাভ করেছে। পূর্বে সারা রাত গান করা হলেও বর্তমানে চার বা পাঁচ ঘণ্টা করা হয়। গানের যারা শ্রোতা থাকে তাদের মধ্যে কখনোই হিন্দু-মুসলিম বা নারী পুরুষ ভেদাভেদ থাকে না।

খ. জারি গানের সঙ্গে মহরমের অনুষ্ঠানের সম্পর্ক

হিজরি মাসের প্রথম মহরম মাসের দশ তারিখে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সমাজে অতীতের কালবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য আজও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই অঞ্চলে মুসলিম সমাজে মহরমের উপলক্ষে করে সাতদিন আগে থেকেই চলে নানা আয়োজন। যে স্থানে মহরম পালন করা হয় তার পাশাপাশি প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাল, ডাল, বাঁশ, টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং মহরমের দুই দিন আগে অনেকেই হাসান-হোসেনের নামে দুটি রোজা করে। মহরমের দিন ঢাক, ঢোল সহ তাজিয়া নিয়ে মিছিল করে, নকল যুদ্ধের আয়োজন করে, লাঠি খেলা চলে।

মহরম উপলক্ষে এই অঞ্চলের অনেক গ্রামীণ এলাকায় মসজিদের পাশে মজলিসের আয়োজন করে কারবালার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। সেখানে মসজিদের ইমাম এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেই কাহিনি বর্ণনা করেন। তাছাড়াও গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুদের একত্র করে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র আকায়ে কেচ্ছা আকারে বর্ণনা করেন। এগুলির পাশাপাশি সর্বত্র লোকমুখে উচ্চারিত হয় বিষাদের সুর 'হায় হোসেন হায় হাসান'। কিন্তু এই অঞ্চলে ব্লেড বা চাবুক দিয়ে নিজের শরীরকে আঘাত করতে তেমন ভাবে দেখা যায় না। কারণ হিসেবে বলা যায়, রাজবংশী সমাজে চরক পূজা ও গাজন প্রথার তেমন ভাবে প্রচলন নেই বললেই চলে। এই সমাজে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য যে, সে বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মহরমের অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই সমাজে তেমন মাতন লক্ষ করা যায় না। ফলে সেদিন জীবনের সাফল্যের আশায় মানুষ নতুন তাজিয়া গড়িয়ে দেওয়ার জন্য মানত করে। এভাবেই এই অঞ্চলে প্রত্যেক বছর মহরম পালন করা হয়।

অতীতের কারবালার ঘটনাকে ঘিরে এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজ একদিকে যেমন একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে মহরম পালন করে অন্যদিকে এই অঞ্চলে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভব ঘটেছে এক নতুন ধরনের জারি গান। তাই আমরা লক্ষ করেছি সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় বিষহরী লোকসঙ্গীতের প্রচলন যেমন রয়েছে তেমনি সেই পালাগান হওয়ার পিছনে কারণ হিসেবে বলা যায়, এই অঞ্চলে বাংলা মাসের অগ্রহায়ণের পর থেকে শীতের আগমন এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শীতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে কৃষি প্রধান অঞ্চল হওয়ায় সন্ধ্যার পর থেকে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ প্রায় অবসরে থাকেন। এই দীর্ঘ সময় কাঠানোর জন্য বিভিন্ন সময় পালাগানের উদ্ভব ঘটেছে। ফলে সাধারণ মানুষ সেই পালাগানের আসর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পারে। বিশেষ চাহিদা থেকে এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজে জারি গান উদ্ভবের দাবী রাখে। সেই গান 'পালা জারি গান' হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি, বাংলার বিভিন্ন এলাকায় মহরমের দিন এই গান করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা করা হয় না। কিন্তু কোচবিহারের মুসলিম সমাজে এই গান সারা

বছর-ই কমবেশি শোনা যায়। ইসলামিক ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনা, ইসমাইলের কুরবানি, হাজরার বনবাস, আইয়ুব নবীর জীবের করুণ কাহিনি, কাসেম সকিনার কাহিনি, মহানবী হজরত মহাম্মদের জীবনের দুঃখের ঘটনা প্রভৃতি কাহিনিকে কেন্দ্র করে জারি গানের আদল গড়ে উঠেলেও কারবালার কাহিনিকে এই গানের মূল বিষয় হিসেবে ধরা হয়।

খ. জারি গানের সঙ্গে স্থানীয় লোকগানের সম্পর্ক এবং গানের ক্রমবিবর্তন ধারা

এই বাংলায় জারি গান মহরমের সময় করলেও কোচবিহারের মুসলিম সমাজে সারা বছর-ই এই গান পরিবেশিত হয়। আমরা এই অঞ্চলের জারি গান অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষত পূর্ববঙ্গের জারি গানের থেকে আলাদা কিনা, সে বিষয়ে যেমন আলোচনা করব তেমনি স্থানীয় ভাওয়াইয়া, কুশান, বিষহরী, চারযুগের গানের সঙ্গে আদান-প্রদানের আলোচনা বর্ণিত হবে। সেই সঙ্গে এই সব লোকগানের মিশ্রণের পরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একটি যে ভিন্ন ধারার জারি গান হয়ে উঠেছে সে বিষয়েও লক্ষ রাখা হবে।

ড. গোলাম সাকলায়েন সাহেব জারী গানের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চল সমূহে সচারাচর মুহররম মাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ নর্তন-কুর্দন সহযোগে কারবালার কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিসাদন্ত্য অংশ অবলম্বন যে গীতিকা গাহিয়া থাকে; তাকে জারী গান বলে’[২]। বাংলার

বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য জারি গান সম্পর্কে বলেছেন, ‘জারী গান দীর্ঘ কাহিনীমূলক গীত ইহার একজন মূল গায়েন গানের মধ্য দিয়া কাহিনী পরিবেষণ করে, নৃত্য পর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নৃত্যের তালে তালে ধুয়া ধরিয়া কাহিনীটি অগ্রসর করিয়া দিতে সহায়তা করে’[৩]। অন্যদিকে আব্দুল হাফিজ তাঁর *লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ* গ্রন্থে জারি গান সম্পর্কে বলেছেন, ‘এ গানের মধ্যে ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যাগত উপাদান কিভাবে পাশাপাশি অবস্থান করছে, বিশ্লেষণ করলেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাঁর পূর্বে আর একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। জারী গানের বিষয় কারবালার বিয়োগান্ত কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হলেও, এই গানের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ও প্রসঙ্গ প্রবেশ করেছে’[৪]। কবি জসিমউদ্দিন জারি গান সম্পর্কে বলেছেন, ‘এই গানের বিষয় বস্তু মুসলমানী পৌরাণিক ঘটনাবলী হইলেও মুহররমের করুন কাহিনী ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন জারী গানের দলে চণ্ডিদাস-রজকিনী, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি কাহিনীও জারির সুরে গাওয়া হয়’[৫]। এইভাবে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি-বিদগন জারি গান সম্বন্ধে যে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর থেকে অতি সহজেই বোঝা যায়- জারী গান যে কাহিনিমূলক গীত ধরনের লোকগান তা যেমন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি গানের মধ্যে মিথের উপস্থিতি এবং হিন্দু ধর্মের বিশিষ্ট চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে এই গানের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, গান শুধু মাত্র মহরমের দশ তারিখে করা হত, সেই গান এক ধাপ এগিয়ে এসে হিন্দু-মুসলিমের লোকগানে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পটভূমিকায় কোচবিহারে প্রান্তিক সমাজে প্রচলিত জারি গানের পালা নিয়ে আলোচনা করা যাক-

বর্তমানে এই অঞ্চলে প্রচলিত জারি গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- শহীদ কারবালার, মোসলেম জীবনী, ইসমাইলের কুরবানি, আইয়ুব নবী জীবনী, কুলসুমের মেছবানি, বেলালের জীবনী, জাবেরের দাওয়াত, আবুমুসা জঙ্গি, মনছুর হাল্লাদ জীবনী প্রভৃতি। এই সব দীর্ঘ কাহিনির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন তত্ত্বমূলক, সামাজিক, কবর কেন্দ্রিক ইত্যাদি ধরনের লোকগান। এছাড়াও এই অঞ্চলে কিছু কিছু খণ্ড জারি গান প্রচলিত আছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে প্রচলিত একটি খণ্ড জারি গানের রূপ হল-

‘উরিয়া যায় রে জোড়া কবিতর, মা ফাতেমা কেন্দে কয়

আজি বুঝি কারবালার আগুন লাগিল মোর কলিজায়
আর মা ফাতেমার কান্দন শুনে আরস থেকে আল্লা কয়
ও জিবরাইল যাওনা চলে বাতাস দেওনা মা ফাতেমার গায়...
আর মা ফাতেমা কেন্দে কয়, বাতাস কেন করছো গায়
পুত্র শোকে জ্বলছে আগুন বাতাসে কি ঠাণ্ডা হয়
আমার কাসেম গেছে রন ক্ষেত্রে, কাসেম যে ফিরে এল না
খালি ঘোড়া ফিরিয়া আসিল, কাসেম কেন ফিরে এল না
দুলদুল ঘোড়া কেন্দে বলে আমার তো কোনো দোষ নাই
তোমার কাসেম গেইছে মারা ওইনা কারবালায়
আর পানি পানি করিয়া কাশেম ঘুরিয়া সেদিন কারবালা
পানি তো আর পেল না
ফোরাদ নদীর পানি বন্দ করিয়া দিয়েছে এজিদে
ও রে কান্দে ছকিনা বিবি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া
আগা রাইতে হইলেক বিয়া পাছা রাইতে বিধুয়া
মোহরানা বান্দিবার সময় কেউ না জিজ্ঞাস করিল
আবার কি মোরে মওলানা কলেমা পড়াইবে
একে একে সবাই গেল কেউ তো ফিরে কই
জয়নাল আবেদিন বন্দী হইলেন এজিদেরও জেলখানায়’[৬]।

এই সংক্ষিপ্ত জারি গানের মধ্যে সাধারণত হাসান-হোসেন-কাসেম-এর হাহাকার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র- ফাতেমা এবং ছকিনার হাহাকার-ই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ মহরমের আচারকে কেন্দ্র করে পুরুষ সমাজে যে শোক পালন করা হয় তা নারী সমাজেও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব পরেছে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, কোচবিহারে দীর্ঘদিন ধরে জারি গান প্রচলিত থাকার ফলে এই ধরনের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

আমরা জানি, পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে জনসমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারের পরিবেশ-পরিস্থিতির আবহে আরবের ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনার বদল ঘটেছে। যেখানে ফোরাদ নদীর পরিবর্তে তিস্তা নদীর কথা বলা হয়েছে। এজিদ-এর দলের হাতে হোসেনের মৃত্যুর পরিবর্তে বাঘে ধরে

খাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে বোঝা যায়, এই অঞ্চলের প্রান্তিক জনসমাজ মহরমের ঘটনা ও তাঁর শোক বা বিরহকে কতটা আপন করে নিয়েছে।

এবার এই জারি গানের বিশেষ কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা যাক- যে গান গুলি মূল পালার শুরুতে মাঝে ও শেষে গীতরূপে পরিবেশন করা হয়। যেমন- ধর্মীয় অংশ বা বন্দনা, তত্ত্বমূলক, সামাজিক, নবীজিকেন্দ্রিক, কবরকেন্দ্রিক মনোরঞ্জনমূলক ইত্যাদি লোকগান।

এই অঞ্চলে কুষাণ, বিষহরী, মনসা, দোতরা ডাঙা পালা, চারযুগের গান প্রভৃতি পালাগানে দেবতা, দিক, গুরু, মাটি প্রভৃতিকে সালাম বা ভক্তি অর্থাৎ বন্দনা করার রীতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে। যা লোকগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয়। তবে প্রত্যেকটি পালা গানের কিছুটা বন্দনা অংশে স্বতন্ত্রতা রয়েছ। বর্তমানে প্রচলিত জারিগানের বন্দনা অংশটির নিম্নরূপ-

'আমার প্রথমে বন্দী আল্লা নবী, দ্বিতীয় তে মা ফাতেমা

আর হজরত আলির চরণে বন্দী, হাসান- হোসেন দুইজনা

আমার খাজা বাবার চরণতে সালাম করি একখানা

আর পীর বাবার চরনতে সালাম করি বারে বারে

আমার ওস্তাত গুরুর চরণে বন্দী সালাম করি এল...

আর পিতা মাতার চরণে সালাম করি বারবার

পূর্বতে বন্দনা করি ভানুদেবের চরণে একখানা

পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা আর মদিনায়

আর সেই খানতে খোদা মাপ করে হাজারো পাপির গোনা

দক্ষিণে বন্দনা করি গিরি সাগরের নদী

আর সেই সাগরে হারাইছে আলী গলারই বাদন খানা

উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত খানা

সেই খানতে বসত করে চরণ আল্লার বিদিসা'[৭]

এই বন্দনা অংশের সঙ্গে স্থানীয় প্রচলিত 'দোতরা ডাঙা' পালাগানের সঙ্গে একটি বন্দনা গীতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তা নিম্নরূপ-

'প্রভু নিরঞ্জন তোমার পদে জানাইলাম প্রনাম
প্রথমে বন্দিয়া গাবো প্রভু নিরঞ্জন
দুনিয়া সৃজিছে গোঁসাই এ তিন ভুবন
স্বর্গপরে বন্দিয়া গাবো মাতা দেবী ভগবতী
তার দুই কন্যা বন্দং লক্ষ্মী সরস্বতী'[৮]

এছাড়াও বিশেষ করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের থেকে বিখ্যাত লোকসংস্কৃতবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য'এর সংগ্রহ করা প্রচলিত জারি গানের বন্দনা অংশের সঙ্গে কোচবিহারের জারি গানের বন্দনা অংশের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

'হায় হোছেন
পূবতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীন্নদী সাগর
যেখানে বাইতো ডিঙ্গা চান্দ সদাগর
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
যেখানে রাইখ্যাছে আলির মাল্লারের পাথর
পশ্চিমে বন্দনা মককা হেন স্থান
উদ্দিশে জানায় গো ছেলাম মমিন মুছলমান
ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়
বাড়িয়ে রান্ধিলে ভাত ব্রাক্ষ্মণে খায়'[৯] - মৈমনসিংহ

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দনা গানটি কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের জারি গানে রূপে বিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ নবীর উল্লেখের মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। তারপরে ফাতেমা, হজরত আলির হাসান-হোসেন

প্রমুখের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে জারি গান যে কারবালার ঘটনা কেন্দ্রিক গান তার পরিচয় পাওয়া যায়। পীরকে স্মরণ করার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, এই সমাজে যে পীরবাদের প্রভাব রয়েছে তার চিহ্ন বহন করছে। অন্যদিকে গুরুর প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই গানে মুর্শিদি গানের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া পিতা-মাতা কে বন্দনার মাধ্যমে গায়কের ব্যক্তিগত আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। এই গানটিতে প্রত্যক্ষ ভাবে লোক ইসলামের পরিচয় পাই। বলাই বাহুল্য যে, এই বন্দনা গানটির মাধ্যমে হিন্দু–মুসলিমের সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় করে তুলেছে, তারও চিহ্ন উপস্থিত রয়েছে। এই গান অতি সহজে প্রান্তিক সমাজের বহু মাত্রিক পরিচয় বহন করছে। যদিও এই গানটিতে পূর্ববঙ্গের বিশেষত ময়মনসিংহ জেলা এবং স্থানীয় লোকগানের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে তারপরও এই অঞ্চলের জারি গানের বন্দনা অংশের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বতন্ত্রের পরিচয় রয়েছে।

তত্ত্বমূলক গান জারি গান

সাধারণত তত্ত্বমূলক কথাকে কেন্দ্র করে বাউল গানের কারবার দেখা যায়। ‘এইসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে বাউলেরা সাধন করিয়া থাকে। বাউল গানকে কোথাও বিচার গান, লাউল গান অথবা মারফতি গান বলে। ময়মনসিংহ জেলার কোথাও কোথাও এইসব তত্ত্বমূলক গানকে মুর্শিদা গান বলা হয়। কিন্তু মুর্শিদা গান আর বাউল গান এক নয়। তান্ত্রিক সহজিয়া এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছ হইতে বংশ পরম্পর প্রাপ্ত তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে সুফি তত্ত্ববস্তু মিশিয়া বাউল গানে এক দুর্বোধ্য ও জটিল তত্ত্ববস্তুর সমন্বয় হইয়াছে। হিন্দু সমাজ হইতে প্রাপ্ত তত্ত্ববস্তুর উপর ছাপ লাগাইবার এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম’[১০]। উল্লেখ্য যে, সময় এবং স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের এই ধারার গানগুলিকে কোচবিহারের প্রান্তিক

সমাজে জারি গানের অংশ বলা হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত একটি দেহতত্ত্বমূলক জারি গানের উদাহরণ হল-

‘গুরু আমার দেহের খবর তোমার কাছে জানতে চাই

গুরু কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম আবার যেন কোথায় যেতে চাই

না ছিল মোর দুইটা আখি, কেমন করে তোমায় দেখি

কোন মুখখানাই ছিল মায়ের গর্ভে জানা ছিল নাই

গুরু আমার দেহের খবর তোমার কাছে জানতে চাই

গুরু কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম কোথায় যেতে চাই’[১১]

গুরু বলতে এখানে পীর বা মুর্শিদকে বোঝানো হয়েছে। শিষ্যের ধারণা গুরুর কাছে সেই দেহের খবর আছে তাই গুরুর কাছে শিষ্য দেহের খবর জানতে চায়। যা সাধারণত মানুষের দৈহিক এবং মানসিক চাহিদার বাইরে অন্যধরনের চাওয়া জানিয়েছে। গুরু পরক্ষনে গানের মাধ্যমে উত্তর দেন-

১)‘মানুষ গাড়ি, ধন্য কারিগরি

বুঝিতে পারিলাম না খোদার লিলা চমৎকার

গোপনে বসিয়া ডাইবার গাড়ি চলায় রাত্রি-দিন

মগজ ও মনিপুর, কানপুরুতে হয় টেলিফোন

আছে দিল্লিরও শহর, কায় জানে তার খবর

লামাখ্যায় আছে ইস্টিশন, টেলিফোনের অপেক্ষায়

আট পুকুরি নয় দরজা তার মধ্যে আটারো মোকাম রয়

গাড়ির সামনে বাতি জ্বলে দিন-রাতি

বিনা ত্যালে জ্বলায় বাতি এমন কারিগর

গাড়ির নিচে দুই চাকা মধ্যে ফাঁকা, দুই পাকে

আছে দুই পাকনা দেখতে যে যায় না পাওয়া

মানুষ গাড়ি, ধন্য কারিগরি

বুঝিতে পারিলাম না খোদার নিলা চমৎকার[১২]

২)‘ওরে মনব দেহা নিয়া গৌরব করিও না

ওরে একবার আল্লা বল রে মমিন ভাই

আল্লা ছাড়া কোন মাবুদ নাই

আর মানব দেহা মোর মাটির ভাণ্ড

ভঙ্গিলে হইবে খণ্ড খণ্ড

ভাঙ্গিলে দেহ জোরাই লাগে না

আর মানব দেহ মোর মাটির পুতুল

কথা খানা যে মুখের ভুল

বলিছে কথা দিনেরই রসুল

মানব দেহা মোর ঘড়ির কাঁটা

চলে যে আকা বাকা

থামিলে ঘড়ি আর তো চলিবে না

বেলা ডুবিলে হবে রাতি

সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী

এই ভব সংসার কেমনে হব পার’[১৩]

৩)‘মন আমার সন্ধান কারি কোন কারিগড়ে বানাইছে

মন আমার দেহ খানি অষ্ট ধাতু খানি

নয় দরজা রাখিয়া বাহাত্তুর হাজার তারে তারে মুসরাইছে

ঘড়ির আটার মোকামে রয়েছে

আটারোটা ইস্টেশন

মগজ আর মনিপুরে হয় টেলিফন

মানুষের কানে কানে টেলিফোন

আমি যদি মেকার হইতাম ঘড়ির জোয়াল বানাইয়া দিতাম

আমার আমার বলে ভবে আর কিছু রইল না রে

অষ্ট ধাতুর ঘড়ির নয় দরজা রাখিয়া

ঘড়ি তৈরি করিয়া, মেকার নিজে ঘড়ির ভিতরে

কারবা বাবার সাদ্য আছে এই ঘড়ির তৈরি করে’[১৪]

এই গানগুলির মধ্য দিয়ে দেখা যায়, গুরু জগতের নানা বস্তু যেমন- গাড়ি, ঘড়ি, নদী, ঘর, পাখি, নৌকা ইত্যাদির রূপকের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন অজানা তত্ত্বের বর্ণনা করছেন এবং গুরু স্বয়ং নিজেও দেহের খবর জানার জন্য আল্লাহ’র স্মরণাপণ হয়। অর্থাৎ সব কিছু সৃষ্টির মূলে যার অসামান্য ভূমিকা রয়েছে, তার তত্ত্ব জানার চেষ্টা করেন। তাই তারা এবিষয় নিয়ে স্বয়ং আল্লাহ’কে নানা প্রশ্নের সম্মুখে দ্বার করান এবং তাকে ঘিরে তত্ত্বমূলক গান করেন। কয়েকটি সৃষ্টিতত্ত্বমূলক গান হল-

১)‘এই যে দুনিয়া কিসের ও লাগিয়া কত সুন্দর বানাইছ সব

ছানা রূপে মানুষ বানাইলা যেমনে নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের আছে কিবা দোষ

হাকিম হইয়া হুকুম কর পুলিশ হইয়া ধর, সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাঁরো

তুমি দিলে খাই না দিলে না খাই

আদম হাওয়া সৃষ্টি করে বেহেস্তা দিলে ঠাঁই

সেই না আদম কেন বেহেস্তে নাই’[১৫]

২)আল্লা দুনিয়া বানাইয়া খেলছে খেলা সেই মানুষটা কেমনে গোনাগার

ছায়া বাজি পুতুল রূপে মানুষ বানাইয়া যেমনি নাছাও তেমনি নাছি পুতুলের আছে কিবা আছে দোষ

হাকিম হইয়া হুকুম কর পুলিশ হইয়া ধর সর্প হইয়া দংশন কর ওঝা হইয়া ঝাড়ো

আল্লা যেমনি নাছাও তেমনি নাছি মানুষের কিবা আছে দোষ

তুমি দিলে খাই না দিলে না খাই

নইলে আমরা মারা যাই[১৬]

৩)'আল্লা তুমি মানুষ দিয়ে মানুষ বানাও
তোমায় খুঁজতে গিয়া আমার হল বিষম দায়
কুলুবুল মমিন আরসের, আল্লা কোরান-হাদিসে যায় পাওয়া
মানুষ কোরান না হইলে কাগজের কোরান কি কথা কয়
দুনিয়ার লোপ লালসার পরে হালাল হারাম সবে খাইছি
তুমি আল্লা যাহা খাইস আমি কি তাই খাইছি?
আল্লা তুমি মানুষ দিয়ে মানুষ বানাও
তোমায় খুঁজতে গিয়া আমার হল বিষম দায়''[১৭]

৪)'মায়েরও ইঞ্জিন ঘরে কে খাওয়াইল খানা মোরে
কোন মুখখানায় খাইছিলাম খানা মুখখানা তো বন্ধ ছিল[১৮]

৫)'আসবার কালে একলা পাঠাইল
কেন একলা পাঠাইল
কি খেলা খেলাইলি রে দয়াল তাও জানি না
কি কথা কোথাও বলিব তাও জানি না
যাবো বা কোথাও তাও ঠিকানা জানি
বিধির খেলা খেলাইল রে মামা
আমি আমার তাও তো চিনিতে পারি না
কি এমন ঘটনা ঘটিল তাও তো বুঝতে পারলাম না
কেন পাঠালো মোর আল্লা রে...[১৯]

এই ভাবে বয়াতিরা সাধারণ মানুষের সম্মুখে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জারি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। আমরা দেখতে পাই, গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় গভীর জ্ঞানের কথা বলা হয়। অন্যদিকে গানগুলির মধ্যে বয়াতিরা কিছুটা স্বতন্ত্র পরিচয় রেখে সাধারণ প্রান্তিক মানুষের কাছে তুলে ধরে। বলাই বাহুল্য, আজকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনসমাজে এই ধরনের গানের মূল্য অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া এই তত্ত্বমূলক গানগুলির সঙ্গে স্থানীয় 'চারযুগের গান' নামক লোকগানের অনেকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

'যখন না ছিল গুরু মোর
না ছিল নৈরাকার
তখন খোদার এ দুনিয়া ছিল
কোন প্রকার?
কোন হরফে আসমান পয়দা গুরু
কোন হরপে জমিন,
কোন হরফে হেন্দু পয়দা গুরু,
কোন হরফে মোমিন'[২০]।

এই তত্ত্বমূলক ধারার গানগুলিতে একদিকে যেমন বৈষ্ণব ও সুফি আদর্শের প্রভাব রয়েছে অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় বয়াতিদের বিশেষত্বের পরিচয়ও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতিটি গান শ্রুতি মধুর এবং জ্ঞানের কথা লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, গানগুলি লোক সমাজে এক ধরনের মনঃশিক্ষার কাজ করছে। যার দরুন এই বিভাগের গানগুলিকে আমরা মনঃশিক্ষামূলক জারি গান বলতে পারি।

এ ছাড়াও বয়াতিরা মুসলিম সমাজের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ *কোরান*-কে ঘিরেও জারি গানের আদল গড়ে তুলেছেন। যেমন-

১)'আলিফ লাম লিপ তিন জনে খেলে

আবার তিনজনে এক না হলে মিলবে কেমনে

লামের উপর আলিফেরা তিনজনে সাধনা করে

আলেফ শুধু বের নিচে একটা নবকা আছে

আলিফে আল্লা হাজির, মিমতে মহাম্মদ নাম’[২১]।

২)‘কিরে কোকিল পাক পাঞ্জা খানা

আদম করে আনা জানা নুরেরও রসুল

নূর আছে নাবির নীচে, কল আছে মনি পুরে

বাবার হাতে দিচ্ছে চাবি আলিপের গঠন

আলিপের আগা মোটা মিম হরফের বোটা লম্বা

লাম হরফের কলিজা মোটা

নাবির তিন ইঞ্চি নীচে তিনটি কত্রা আছে

আরও পাঁচটি কত্রা আছে নাবির উজানে

ও তার উপরে হাওয়া, নিচে পানি মাঝখানে আগুনের খনি

দিবানিশি জ্বলছে আগুন পুবালি হাওয়ায়’[২২]

এই গান দুটির সঙ্গে লালনের একটি গানের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়-

‘আলিফলাম মিম আহার নূরি

তিন হরফের গম্ভু ভারী

আলিফে হয় আল্লা হাদি

মিমে নূর মহম্মদী

লামের মানে কেউ করলে না

নূক্তা বুঝি হল চুরি’[২৩]।

এই গান দুটির মধ্যে লালন ফকিরের গানের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও সময় এবং স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানের নানা অংশে কথার বদল ঘটেছে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত জারি বয়াতি আহাম্মদ আলী বলেছেন- ‘গানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন গভীর জ্ঞানের কথা লুকিয়ে আছে অন্যদিকে তেমনি জনসমাজে *কোরান*এর বাণীও প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষত আমরা বাংলা শেখার পূর্বে যেমন অ, আ পড়তে শিখেছি,

তেমনি *কোরান* শেখার পূর্বেও 'আলিফ, বে' শিখতে হয়'[২৪]। অর্থাৎ এই গানের মাধ্যমে একই সঙ্গে দুটি বিষয় জনসমাজে তুলে ধরা হয়।

অন্যদিকে দেখা যায়, এই অঞ্চলে একসময় জনসাধারণ মানুষ গীত পরিবেশন করে হাতি-কে পোশ মানা হত। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, বর্তমানে বন-জঙ্গল কমে যাওয়ায় হাতি-কে যেমন আর দেখা যায় না, তেমনি তাকে কেন্দ্র করে যে সকল গাওয়া হত সেগুলিও লুপ্তপ্রায়। যেমন-

'আল্লা আল্লা বলরে ভাই হায় আল্লা রসুল
কোন মহলের হাতি রে ভাই হায় আল্লা রসুল'[২৫]।

এই গানটির প্রথম বাক্যের অংশটি জারি গানের বহু জায়গায় ব্যবহার হয়।

'ওরে একবার আল্লা বলরে মমিন ভাই
আল্লা ছাড়া মাবুত কেহ নাই......'[২৬]।

এই গানটিতে প্রত্যক্ষ ভাবে জারি গানের প্রভাব পড়েছে। বলাই বাহুল্য যে, জারি গান প্রান্তিক মুসলিম সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে সামগ্রিক লোক সমাজের লোকগানে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক সমাজের মানুষকে পরকাল বা বিদায় বেলার জন্য বয়াতিরা এক বিরহ ধারার গান করে। এই ধারার গানগুলি মধ্যে কিছু জনসমাজে প্রচলিত গান এবং কিছু স্বতন্ত্র গান করে থাকে। সাধারণত পালার শেষেই এই ধরনের গান করতে দেখা যায়।

১)'আমার বিয়ার কয় দিন আছে বাকি
যেদিন আমার বিয়া হবে আত্মীয় সজন সবাই আসবে
বিয়ার সাজন করে পারার নাইওরী
আমার বিয়ার বাসের পালকি বানাইবে পাড়ার নাইওরি
আমার বিয়ার কয়দিন আছে বাকি
বরাই পাতার গরম জলে শোয়াইবে মশারির তলে

আঁতর গোলাপ করবে মাকামাখি, আমার বিয়ার কয়দিন আছে বাকি

যে বা হবে বিয়ার দুলা নাকে কানে দিবে তুলা

সাদা কাপড় দিবে পড়ে, আমার বিয়ার কয়দিন আছে বাকি

আত্মীয়সজন বন্ধু বান্ধব যারা, আমার বিয়ার যৌথক দিবে তারা

সেদিন যৌতক দিবে একমুটি মাটি, আমার বিয়ার কয়দিন আছে বাকি'[২৭]।

২)'কোন দ্যাশতে বানাইলে ঘর দয়াল রে

কাচা মাটি সাউনি দিলে দয়াল

বাসের হবে মোর হাংরা রে

কিছুই নিয়া য্যাতে পারলাম না

ওরে যে চারজন মোরে কবরে নিয়া গেল

তারাও গেল না সঙ্গে আসিল না[২৮]

৩)'ওরে মন তোরে বুঝাইতে পারিলাম না রে

তুই সে আমার ময়না।

যে স্বপন দেখিয়া আসিলাম রে

আমার সেই স্বপন কি মিথ্যা হয়ে পারে!

আমি সোনা দিয়া বান্দিলাম ঘর

ঘুনে খারা করিল জরজর

আমার শিমুল কাঠের নৌকা খানি রে ওরে দয়াল...

সেই নৌকা যায় যে ডুবিয়া

আমার আল্লা পাকের কোরান খানি ওরে দয়াল

নবীজির মুখের বানী আমার সেই কোরান কি মিথ্যা হতে পারে রে

ওরে আজরাল যেদিন আসিবে কাছে ওরে দয়াল

সেই দিন রাসুল বিনে কে পার করাইবে রে মোর'[২৯]

৪)'মাটির বাড়ি মাটির ঘর মাটি হবে ঠিকানা

আসছো একা যাইতে হবে একা

সঙ্গে কেউ যাবে না

এমন ঘরে যাইতে হবে নাই গো সেখানে মাটির

উপর দিকে চায়া দেখ শুধু বাসের হংরা

এই পৃথিবী যেমনি গড়া তেমনি ভরা তেমনি পরে রবে

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে

থাকিবে আমার আকাশ বাতাস থাকিবে নদীর জল

পূর্বের মতো চলিবে তারা চলিবে নদীর জল

আমি শুধু থাকিব না মায়ার সংসারে'[৩০]

৫)'আমার কালো ময়না রে সোনার মোনা রে

একদিন তো যাইবে তো পাখি ছাড়িয়া

বাসের পাতার গরম জলে

শোয়াইবে আমায় মশারির তলে

আতর গোলাব চন্দন লাগাইবে

সেদিন ছেলে মেয়ে কান্দা কাটি করিবে

সিতানে মোর দুধের বাটি থাকিবে দুধের বাটি মুখে তুলিব না

সেদিন কত রঙ্গের কত জামা কাপড় কিছুই তো রাখিবে না

কিছু তো পড়াইবে না, সাদা কাপড় সেদিন পড়াইবে

যেদিন আমার আসবে দুলা নাকে কানে পড়াইবে তুলা

রঙ্গের রঙ্গবে সাবান লাগাইবে,

চারজনে ঘারে করে লইয়া যাবে আপন করে

ছেলে মেয়ে কতই কান্দিবে সোনা ময়না, কালো ময়না রে...'[৩১]

প্রত্যেকটি গানের মাধ্যমে মানুষের এই জগৎ থেকে চলে যাওয়ার দিন অর্থাৎ মৃত্যুর দিনের কথা উল্লেখ্য করা হয়েছে। গান মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, একদিন এই জগৎ ছেড়ে চলে আলাদা জগতে যেতে হবে। বিশেষত সাধারণ মানুষ সেই দৃশ্য স্মরণ করে অসৎ কাজ থেকে যাতে বেরিয়ে আসে এবং দিনের পথে চলে। গানের ভাবনার দিকে লক্ষ রেখে বলা যায়, জারি গানের অংশ হিসেবে দাবী রাখে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, শোকের গান থেকে তত্ত্বমূলক গানে সরে আসছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, শোকের পালাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশন করার ফলে বয়াতিদের একধরনের বিরক্তির চলে আছে, তাই মাঝে মাঝে এই ধরনের গান করার মাধ্যমে বয়াতিরা একধরনের বিশ্রাম নিতে চায়। অন্যদিকে শ্রোতাদের মধ্যেও একই ভাব লক্ষ করা যায়। কার্যত বয়াতিরা দুই দিকের কথা ভেবে এই ধরনের তত্ত্বমূলক গান মূল পালার মাঝে মাঝে গীত হিসেবে প্রকাশ করেন। যা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকার ফলে জারি গানে অংশ হিসেবে দাবী রেখেছে।

হজরত মহাম্মদ (নবিজী) নির্ভর জারি গান

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের মানুষের নবীজির উপর অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রয়েছে। তাই তাকে ঘিরে প্রান্তিক মুসলিম সমাজে বছরের নানা সময়ে না'ত বা গজল ও মিলাত পাঠ করা হয়। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত একটি না'ত মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়-

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়

আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়...।

এই ভাবে প্রান্তিক সমাজে নবীজিকে নিয়ে চর্চা দেখা গেলেও জারি গানের মাধ্যমে বয়াতিরা এক ভিন্ন ধরনের প্রেম ও ভালবাসা দেখিয়েছেন। বিশেষ ভাবে লক্ষ

করা গেছে, হাসান-হোসেনের জীবনে ঘটে যাওয়া করুন কাহিনি ঘিরে জারি গানের আদল তৈরি হলেও সেই কাহিনির মধ্যে ক্ষণিকের জন্য নবীজির ভবিষ্যৎ বানির কথা উল্লেখ আছে। এই অঞ্চলের প্রচলিত 'শহীদ কারবালা'র পালায় বর্ণিত পাই-

'একদিন দিনের নবী দেখেছিল স্বপ্ন মোবায়ার পুত্রের দ্বারা হবে হোসেনের মরণ'[৩২]

এই বাক্যটির মাধ্যমে বোঝা যায়, এজিদের চক্রান্তে ইমান হোসেনের মৃত্যুর ঘটনা নবীজির পাওয়া স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ বাণীর কথা সফল হয়। এক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে কারবালার ঘটনায় নবীজির ভূমিকা রয়েছে। যা মানুষকে নানা ভাবে ভাবিয়ে তোলে। এছাড়াও ইসলাম ধর্মে আল্লাহ'র পরেই হজরত মহাম্মদকে দেখানো পথ মুসলিমরা কমবেশি অনুসরণ করে এবং তাঁকে ঘিরে বছরের বিভিন্ন সময়ে দোয়া, মিলাত, জলসার(ধর্মীয় কথা আলোচনা) প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ফলত এই গানের বয়াতিরা শহীদ কারবালার পালার সঙ্গে সঙ্গে নবিজীর দারিদ্রতার জীবনী ঘিরে 'জাবেরের দাওয়াত', কুলছুমের মেছবানি, নামে পালা গানের ব্যবস্থা করছেন। অন্যদিকে তাঁকে ঘিরে জারি গানের সুরে খণ্ড খণ্ড গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যেকটি পালার কাহিনিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নবীজির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যা মানুষকে মনোমুগ্ধ করে তোলে। জারি গানে প্রচলিত খণ্ড খণ্ড গীতগুলির উল্লেখ্য-

১)'আমার দয়াল নবী আর আসিবে না জগতে

আমার দয়ালও নবী প্রেমের ছবি আর হবে না জগতে

নবীর ৬৩ কাল জিন্দিগি এলাও কান্দে উম্মতি

হাশরের দিনে-এ উম্মতও বিনে যাবে না নবীজি মোর জান্নাতে

আল্লার সনে নবীর প্রেম, কোরান-এ যায় জানা

নবী না হলে তো এ দুনিয়া তো পয়দা করত

আল্লার প্রেমে পাগল হল নবী মোস্তাফায়

মক্কা মদিনায় নবী আমার ঘুরিয়া বেরায়

নবীর সঙ্গে প্রেম করল নাম অসকরনী

নবী মরার পড়ে গায়ের যুব্বা পেয়েছিল তিনি
নবীর প্রেমে খাগা বাবা পাগল গেল হইয়া
আজমির শরীফে আছেন রে বাবা ঘুমাইয়া
খাজার প্রেমে পাগল হইল নিজামুদ্দিন আউলিয়া'[৩৩]।

২)'সাপায়তের নৌকা নবী সাজাইয়া
ফলছি রাতের ঘাটে নৌকা রাখিবে বাঁধিয়া
মাগো, ইমান হাসান হোসেন দুই ভাই দুই ধারে বসিবে
মা ফাতেমা নৌকা বসিয়া হাল ধরে
রূপার টাকা কাগজের নোট সেদিন চলবে না
বে নামাজী তো আর তুলিবে
নামাজ পরও রে রোজা রাখ
দীন থাকিতে সবাই কর আখেরতের কামাই
এই কথা বুঝিয়াও বোঝো না রে ভাই ...
ওরে দিন থাকিতে আল্লা নবীর নামটি ভুলিবে না'[৩৪]।

৩)'ওরে বাবা কামলিওলা শান্তি দে মোর কলিজায়।
ওরে আয়রে আমার বুকে আয়
ওরে প্রিয় মহাম্মদ, ওরে ছল্লেওলা
শান্তি দে মোর কলিজায়।
ওরে ডাক রে তোর কৃতদাসে
শান্তি দে মোর কলিজ'[৩৫]।

৪)'আমি গোনাগার ভরসা তোমার, ডাকি বারে বারে

কামলি মহাম্মদ ডাকি বারে বারে

আমার এ গোনা তোমারই জানা

মাপ করিয়া দেও সাই রাব্বানা

উলজি রাতের পারে দারাইয়া আমারে মাপ করিয়া দিও’[৩৬]

৫)‘শিশু নবী সেদিন কিসের নামাজ পড়িলী

মানুষ হইয়া চিনলিনা সেই না দয়ার নবীরে

শত শত পাথর পাপিরা ওই না মারিল

আটারো হাজার পাথর মারিল সবেই গেল সহ্য করি’[৩৭]

৬)‘মা আমিনার কোলে দেখ চাঁদ উঠেছে

যাহারই প্রেমে এই জাহান পয়দা হইয়াছে

মা আমিনার নয়ন মনি ওরে সৃষ্টি কুলের সেরা যিনি

জিন পরী ফেরেস্তারা সব পাগল হইয়াছে

আমার নিজে খোদা আসিক হইয়া নামের প্রতিনাম রাখছে জাইয়া’[৩৮]।

এই গানগুলি একদিকে যেমন বয়াতিদের স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি নবীজি সম্পর্কে একটা লোকায়ত ইতিহাসের বর্ণিত হয়েছে। যেখানে নবীজির মৃত্যুর পর যেমন অসকরনি তাঁর গায়ের জুব্বাখানি পেয়েছিল, তেমনি সেই ধারা ভারতে খাজা বাবা ও নিজামুদ্দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, এই গানে চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরূপেই নবীজিকে দেখানো হয়েছে। এছাড়া হাশরের দিনে তাকে জান্নাতের সর্দার হিসেবে দেখনো হয়েছে। তাই অন্য একটি গানে নবীজির জন্য বয়াতি নিজেকে কৃতদাস হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। ফলত আমরা একই সঙ্গে গানগুলির মধ্যে একদিকে যেমন প্রান্তিক সমাজের মানুষদের এক ধরনের ভিন্ন মানবিক

আবেদনের পরিচয় দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি নিবিড় ভাবে সুফি এবং বৈষ্ণব তত্ত্বের ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক ঘটনা নির্ভর জারি

সাধারণত সামাজিক গান মানুষের আশা- নিরাশা, সুখ- দুঃখ ও মনের সুক্ত নানা অব্যক্ত কথা নিয়েই পরিবেশিত হয়। যা আমরা সারি, মুর্শিদা, বাউল ও ভাওয়াইয়া প্রভৃতি লোকগানে লক্ষ করি। কোচবিহারের জারি গানের ধারায় এই সামাজিক ঘটনা নির্ভর নানা গানের উপস্থিতি রয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, জারি গানে যেমন ভাওয়াইয়া গানের প্রভাব পড়েছে তেমনি ভাওয়াইয়া গানেও এর প্রভাব এড়িয়ে যায়নি। এমনকি আব্বাসউদ্দিন স্বয়ং নিজে স্বীকার করেছেন যে, 'মর্শিয়া, কুশান, আর মুহররমের গান থেকে তিনি প্রেরনা লাভ করেন'[৩৯]। 'প্রাথমিক ভাবে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের জন্য তিনি রংপুর ও কুচবিহারে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে জারি, সারি, ভাটিয়ালী, ও দেহতত্ত্ব নির্ভর গানের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেন'[৪০]। এই লোকগানটি বাওদিয়া বা ভবঘুরে, মইষাল, মাহুতের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল বলে ভাওয়াইয়া হিসেবে পরিচিত। বিশেষত, 'হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবিরত নদী গুলো ভাঙন সৃষ্টি করত। এই ভাঙনের তীরে বাস করা জনজীবন ছিল অত্যন্ত বেদনা-বিধূর। তাই এই ভাঙন শব্দ থেকে ভাঙ্নীয়া বা ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে'[৪১]।

এই লোকগানগুলিতে নারী বা পুরুষের কণ্ঠে যে বিরহের সুর বা কথা শোনা যায়। তা অনেকটা খণ্ডমূলক জারি গানের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া ভাওয়াইয়া গানের মূল লোকযন্ত্র দোতারা, তা জারি গানেও কখনো কখনো উপস্থিত থাকে। একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ-

'আজি কিসের মোর আতর কিসের মোর কাপড় সই

কিসের মোর গায় সাবান মাখা

ওরে স্বামী না মরিছে সিঁদুর না পড়িছে

হস্তে না গেইচে শাঁখা'[৪২]।

এই গানগুলিতে যেভাবে প্রান্তিক জন-সমাজের নারী বৈধব্যের চিত্র ধরা হয়েছে, তার অনুরূপে চিত্র বয়াতির মুখে ছকিনার বৈধব্যের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ভাওয়াইয়ার গড়ান সুরের মতো করে গাইতে শোনা যায়-

'গাছের বল লতা পাতা, মাছের বল পানি

পুরুষের বল হল টাকা পাইসা, নারীর বল সোয়ামি

যে বা নারীর আছে স্বামী আন্দিয়া বাড়িয়া খায়

যে বা নারীর নাই বা সোয়ামী দিনে আন্দি হারা[৪৩]।

এই গানের বর্ণনায় বোঝা যায়, প্রান্তিক কোনো অঞ্চলের রমণীর বৈধব্যের দুঃখ-যন্ত্রণার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে ইসলামিক ঐতিহাসিক একটি চরিত্র (সকিনা) হিসেবে বর্ণনা না করে প্রান্তিক কোনো রমণীর বৈধব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ছকিনা হয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ নারী। অন্যদিকে গানটিতে মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে নারীর অন্তঃসত্ত্বা সময় থেকে পরবর্তী শিশু জগতের মুখ দেখা পর্যন্ত-

'এক মাসে বেলা জানি কি না জানি

দুইয়ো মাসের বেলা কিসের কানাকানি

তিন না মাসের বেলা রক্তে ছান্দে গোলা

চার না মাসের বেলা হার মাংস জোড়া

পাঁচ না মাসের বেলা পঞ্চ পুষ্প ফুটে

ছয় না মাসের বেলা যুগ উল্টি বসে

সাত না মাসের বেলা সাধ খাইতে চায়

আট না মাসের মন পবন জিয়ায়

নয় মাসের বেলা নবগুণ স্থিতি

দশ মাসের বেলা জনমের মুরতি

প্রসব বেদনায় মা জননী কান্দে জারে জারে

রক্ষা কর মাবুদ বিপদ কর পার

তাই তো আল্লা পাকের দয়া হল দুনিয়ার মাঝারে

গর্ভের সন্তান পাঠাইয়া দিল, কান্দে মায়ের তরে তরে

মা জননী দুঃখের খনি সন্তানকে কোলায় নিয়া

যত দুঃখ কষ্ট পাইল সবেই গেল ভুলিয়া

মুখখানা গড়াইছে পূর্ণিমার শশী, নাকটা বানাইছে কৃষ্ণ নাথের বাঁশি'[৪৪]

এই গানটির অনুরূপ জারি গানে 'ইসমাইলের কুরবানি' পালায় হাজার অন্তঃসত্ত্বা সময়কালীন সন্তান প্রসবের দিন পর্যন্ত বর্ণিত হলেও জারি গানের গায়করা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বর্ণনা করছেন-

১)মা বিনে বান্দব নাই রে এই ভব সংসারে রে

মায়ের মতো ধন কি হতে পারে এ জগত সংসারে

দশ মাসে দশ দিনে পোসবের বেদনা গেল সহ্য করি

এক পাঁজর ভিজিছে রে গুয়ে আর মুতে এক পাঁজর ভিজিছে মাগ মাসিয়া শীতে

দুধও মিটা দইও মিটা ইয়ার থেকে মিথা মাও বড় জননী

বিদেশেতে কোন সন্তানের যদি বিপদ হয় অন্য কেউ না জানিতে পায় মায়'[৪৫]

২)ছোট থাকিয়া বড় করিয়া বিয়া দেয়

মায়ের গায়ে ছিয়া কাপড় সন্তানকে নয়া

সারা রাইতে ঘুমিয়া ছায়াইয়া তুইসের আগুন পোয়া

এক করত ভিজাইতে জননী গুয়ে আর মুতে

আর করত ভিজাইতে জননী মাও মোর পুষ মাঘ মাসিয়া শীতে

সেই না মায়ের সন্তান আমারা সবাই হিন্দু কিবা মুসলিম এলা

বড় করিয়া সেই না মাকে ভাত কাপড় দেয় না

দুই নয়নের জলে মাটি যাচ্ছে ভিজে'[৪৬]

৩)ও হ দয়াল বিধি মায়ের মতন আদর দিতে পারে

পর কি আপন হয় আপন কি মায়ের মতন হয়

ওরে মায়ের মতো আদর দিতে পারে

আমার মায়ের মতন আদর দিতে পারে

কারো ছেলে যদি কুষ্ট হয় ও হ রে

তারে মায় কি ফেলে দেয় ওরে

পরে কি বোঝে রে পরের ব্যাথা

নয়ন ভরিয়া মায়েরে দেখি তোমরা একটু দারাও রে

তোমরা কোথায় যাচ্ছ মায়েরে লইয়া

কে ডাকিবে বাবা বলে মাও যদি মোর যায় চলে'[৪৭]

এই গানগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন জারি গানের গায়কদের বিশেষত্ব লক্ষ করছি তেমনি গানের মাধ্যমে পুরুষের চাইতে নারীদের যে একটু অধিক কষ্ট বহন করতে হয় তারই বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষত সন্তান এবং মায়ের ভালবাসার চিত্র যেন প্রান্তিক সমাজের বাস্তবতা ধরা পড়েছে। এছাড়া এই ধারার গানে খুঁজে পাই নর-নারীতত্ত্ব নির্ভর তথ্য-

'কতই ঘুম ঘুমাইলি মনোরে প্রেমের বাস্ক রইল খোলা

চোরার চুরি করে নিল তোর বিনা সুতার মাল

নারী জাতি কাল সাপিনী জগত খেয়ে রয়

পুরুষ মরে অনবিচারে নারী দুষী নয়

নারী হইল পায়ের বেরি, পুত্র হইল শাল

ভবের মায়ায় বন্ধি হইয়া খাটিল জঞ্জাল'[৪৮]

গানটির মধ্যে নর-নারী সম্পর্কে এক ভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেখানে কোনো বিষয়ে শুধু মাত্র নারীকে দায়ী করেননি, সেই সঙ্গে পুরুষকেও সমান দায়ী করেছেন। এই গানের মধ্যে শুধু মাত্র নারী-পুরুষের বাইরের সুখ-দুঃখের কথাই ব্যক্ত হয়নি, সেইসঙ্গে তাদের অন্তরের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার কথাও আলোচিত হয়েছে।

এই ধারার জারি গানে প্রান্তিক এলাকার কোনো নারী বা পুরুষের নানা ভাবে পাওয়া দুঃখ-যন্ত্রনার কথা প্রকাশ করা হয়। সেই করুন কথাগুলি অনেকটা ভাওয়াইয়ার সুরে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও মনোরঞ্জনমূলক কিছু মারফতি ধরনের গান করা হয়। যেমন-

১)‘সালের গাছে সইলের পোনা বগায় ধরি খায়
বাবার বিয়া নাই হইতে বেটি নাইওর যায়

২)গিরির বৌ ধান খায়
মুরগী নিন টোপে
এলা গাইয়ের দুধ কুকুরে খায়
বাছুরে বসিয়া ভোকে

৩)বারো কাঁটা জমি ছিল তেরটা তার আইল
শশরি বৌয়ে ঝগড়া করে ভাশুরে খায় গাইল

৪)আজব কাণ্ড দেখিয়া আসিলাম রে চিন শহরে ময়দানে
মাটি ফাটিয়া উঠছে মানুষ তারে কয়জনে চেনে
পানির নীচে ধরল আগুন মাছের দৌড়া দৌরি
বাবার বিয়ার তারিখ লইয়া ছেলে চলছে মামার বাড়ি

৫)রাজার বাড়ি চুরি হইল নদিত দিল সিং

বাসের আগালে মসারি টাংগে মাটিত পারে নিন

রাজার বাড়ি চুরি হইল মালিক পড়িল ধরা

হাইকোটতে গিয়া দেখি হাকিম তিনজন মরা

আশা রইল সুন্দর বনে কপিল রইল ডালে

বিড়ালে আর হস্তিনি ডুব দিল পাতালে'[৪৯]

এই গানগুলি প্রাথমিক ভাবে মনোরঞ্জনমূলক হলেও গভীর জ্ঞানের কথা লুকিয়ে আছে। সাধারণত এই ধরনের গান পূর্ববঙ্গের বেশি প্রচলিত থাকলেও এই অঞ্চলের বয়াতিরা জারি গানের মাধ্যমে এই ধারার গানকে জীবিত রেখেছে। অন্যদিকে আব্বাসউদ্দিনের ভাই করিমুদ্দীনের লেখা একটি ভাওয়াইয়া গানে জারি গানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

'ভাই মোর কুচবিহারী রে
চতুর্দিকে জ্বলে সুরুজ বাতি
তোমার ঘরে ক্যানে আন্ধাররাতি
হায় রে হায়
পরার বোঝা তোমরা
কতদিন বইবেন ভাই-
ও ভাই
বালুটিটি পক্ষী কান্দে
নিজের আহার খুঁজির বাদে রে
তোমরা বুঝি ন্যাও তোমার অধিকার
ও ভাই......
এক বেলা তোমরা অন্ন জোটে
পেন্দনত তোমার কাপড় কোনটে
হায় রে হায়.....[৫০]

এই গানটিতে যে 'হায় রে হায়' বাক্যটি রয়েছে, তা জারি গানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় এই গানটিতে জারি গানের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, জারি গানের সঙ্গে অন্যান্য লোকগানের সঙ্গে যে একটা দীর্ঘদিনের আদান প্রদানের সম্পর্ক আছে তারই চিহ্ন এই ধারার গানগুলি।

কাহিনিমূলক জারি গানের আলোচনার প্রেক্ষিত

এই অঞ্চলে বয়াতিরা মূল কাহিনির সঙ্গে উপরিউক্ত ধারার গানগুলির সহযোগে জারি গানের পালাগুলি পরিবেশিত করে।এই প্রচলিত জারি পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহীদ কারবালার, মোসলেম জীবনী, ইসমাইলের কুরবানি, আইয়ুব নবী জীবনী, কুলসুমের মেছবানি, বেলালের জীবনী, জাবেরের দাওয়াত, আবুমুসা জঙ্গি, মনছুর হাল্লাদ জীবনী প্রভৃতির লিখিত রূপ তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল ধরে গুরুর কাছ থেকে শিষ্য শেখার মাধ্যমে গানের ধারা বেঁচে রয়েছে। গানের সময় তাদের ইচ্ছা খুশি মতো অনেকটা ছন্দ মিল করে পাঁচালী আকারে বিশ্লেষণ করে। তবে গানের মূল বিষয় একই রয়েছে। গানের পালাগুলি শোকের ঘটনা দিয়ে শুরু হয় এবং পরিসমাপ্তিতেও উপস্থিত থাকে শোকের চিত্র। এই ভাবেই মূল কাহিনি জারির সুরে বলা হয়। প্রত্যেকটি গল্প দুঃখের ঘটনা, অলৌকিকতা, স্থানীয় লোকসমাজের ভাবনা-ভাষা প্রভৃতির মিশ্রণে বর্তমানে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ পটভূমিকায় বর্ণনা করা হয়। সাধারণ মানুষেরা এই গানকে অতি সহজেই আপন করে নিয়েছে। বয়াতিদের কথা অনুসারে, এই অঞ্চলে জারি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ প্রান্তিক লোকের মধ্যে এই গান গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সুরের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, গানের মাঝে মাঝে খাইয়া, যাইয়া রে, ব্যবহার করা হয়। যা পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষার নিদর্শন বহন করছে। আবার কোথাও কোথাও ভাওয়াইয়া গানের সুর লক্ষ করা যায়। সুরের ক্ষেত্রে একটা মিশ্রণ ঘটেছে। ফলত একটা ভিন্ন সুরের উদ্ভব ঘটেছে। যাকে আমরা ‘গড়ান’ সুর বলতে পারি। ‘গড়ান’ বলতে এখানে বোঝানো হয় স্থানীয় নর-নারী কোনো গভীর দুঃখ পেলে কান্নার সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি করে সেই ‘গড়ান’। এই গীতের মধ্যে ‘ধুয়া’ নামে একটি অংশ আছে। সাধারণ সংগীতের যেমন চিতেন অংশ থাকে। যা প্রত্যেক গীতের শেষে, মাঝে বা আগে একটি অথবা দুটি এই ‘ধুয়া’ রীতির প্রচলন আছে।

এই অঞ্চলের প্রচলিত কুষাণ, সত্যপীর বিষহরী, মনসা, দোতরা ডাঙা পালা, চারযুগের গান প্রভৃতি গানের প্রভাব পড়েছে জারি গানে। বিশেষত বন্দনা অংশ ছাড়াও কাহিনি বর্ণনা অংশেও প্রভাব পড়েছে। যেমন কুষাণ গানের ক্ষেত্রে দেখা যায়-

> 'কুষাণ পুরোপুরি রামায়ন নির্ভর লোকনাট্য নয়। এর মধ্যে মাঝে মাঝে লোকজ উপাদান ঢুকে পড়েছে। পুরান থেকেও এর কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে'[৫১]।

এই ভাবনা জারি গানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দুঃখের ঘটনা বা ইসলামিক ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে অলৌকিকতা, স্থানীয় লোকসমাজের ভাবনা-ভাষা, স্থানীয় লোক গান প্রভৃতির মিশ্রণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, জারি গানের কাহিনি গঠনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের লোকনাট্য বা পালা গানগুলির বিশেষ ভাবে অবদান রয়েছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই বাংলা জারি গানের পরিচয়। সেখানে দেখা যায়, মহরমের দিনে জারি গান করা হয়। অর্থাৎ তা শুধু মহরম আচার কেন্দ্রিক গান। সাধারণত এই বাংলায় ১০ই মহরমের শোকের সংস্কার থেকে বেড়িয়ে এসে বছরের অন্যান্য সময়ে তেমন ভাবে জারি গান শোনা যায় না । অন্যদিকে পূর্ব বঙ্গের জারি গান বিভিন্ন এলাকায় সেই গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে এসে পালা আকারে জারি গান করা হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহারের জারি গানের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, উক্ত দুটি ধারা থেকে একধাপ এগিয়ে এসে স্বতন্ত্র জারি গানে পরিণত হয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, একটা নতুন ধারার জারি গানের উদ্ভব ঘটছে। যেখানে মহরমের বিষাদের কাহিনি নিয়ে মানুষ গণ্ডি আবদ্ধ থাকলেন না। যেখানে যুক্ত করলেন নানা ইসলামিক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং খণ্ড খণ্ড গান। যা ভাষা, সুর, বর্ণনা ভঙ্গি প্রভৃতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের জারি গান ব্যতিক্রম দেখা গেল। আর গানগুলির মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের স্নেহ- মায়া-মমতা, সুখ-দুঃখ, আত্মার শাশ্বত প্রেরণা, বিরহ-বিচ্ছেদের মর্মদাহ, আশা-নিরাশা বর্ণিত হয়েছে। যা কোচবিহারের জারি গান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং প্রান্তিক লোকসমাজের ঐতিহ্য হিসেবে দাবী রাখে।

তথ্যসূত্র

১) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর–চামতা, তারিখ-২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩. ২৩ মিনিট

২) চৌধুরী, শীতল, *লোকসঙ্গীত চর্চা*, রূপা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮,পৃ ৩৮

৩) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলার লোক সাহিত্য*, ক্যালকাটা বুক হাউস ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কল, প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ ৫০০

৪) চৌধুরী, শীতল, *লোকসঙ্গীত চর্চা,* রূপা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮,পৃ ৩৮

৫) উদ্‌দীন, জসীম, *জারীগান,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, পৃ ১

৬) সাক্ষাৎকার, মমিদুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর-চামতা, তারিখ- ২০ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০১. ২০ মিনিট

৭) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, স্থান-কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২০ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ১০ মিনিট

৮) দাশ, অভিজিৎ, *তিস্তা উৎস থেকে মোহনা,* এখন ডুয়ার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ ১৪২

৯) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলার লোক সাহিত্য,* ক্যালকাটা বুক হাউস ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কল, প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ ৫০০

১০) উদ্‌দীন, জসীম, *মুর্শিদা গান,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, পৃ ১৫

১১) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর-চামতা, তারিখ- ২৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩.২৩ মিনিট

১২) তদেব

১৩) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া,স্থান- কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২০ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ১০ মিনিট

১৪) সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া,স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৩.২৭ মিনিট

১৫)তদেব

১৬) সাক্ষাৎকার, কপির হোসেন, স্থান-কোচবিহার, দিনহাটা, গোবরাছড়া, তারিখ- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪.২৭ মিনিট

১৭) তদেব

১৮) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর–চামতা, তারিখ- ২৪ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩.২৩ মিনিট

১৯) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২১ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২.২২ মিনিট

২০) দাশ, অভিজিৎ, *তিস্তা উৎস থেকে মোহনা,* এখন ডুয়ার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ ১৫৯

২১) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, কোচবিহার, সিতাই, বত্তর–চামতা, তারিখ- ২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩.২৩ মিনিট

২২) তদেব

২৩) শর্মা, উমেশ, *মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রকাশ কাল ২০০৫, পৃ ১৫৯

২৪) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, কোচবিহার, সিতাই, বত্তর–চামতা, তারিখ- ২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩.২৩ মিনিট

২৫) দে, ড. দিলীপ কুমার, *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি,* অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ ৪৭

২৬) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, স্থান-কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২. ২২ মিনিট

২৭) সাক্ষাৎকার, সিদ্দিক মিয়া,স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ- ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২.২০ মিনিট

২৮) তদেব

২৯) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২১ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২.৫৫ মিনিট

৩০) সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, দিনহাটা(নয়ার হাট), তারিখ- ১৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ২০ মিনিট

৩১) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, কোচবিহার, সিতাই, বত্তর–চামতা,তারিখ- ২২ নভেম্বর, ২০১৮ সময়- বিকাল ৩.২৩ মিনিট

৩২) সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৩.২৭ মিনিট

৩৩) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২১ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২.২২ মিনিট

৩৪) সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৩.২৭ মিনিট

৩৫) তদেব

৩৬) সাক্ষাৎকার, মমিদুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর–চামতা, তারিখ- ২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০১. ২০ মিনিট

৩৭) তদেব

৩৮) তদেব

৩৯) হোসেন, আমজাত, *কামরূপ থেকে কোচবিহার,* সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, ২০১৪, পৃ ২৯৩

৪০) হোসেন, আমজাত, *কামরূপ থেকে কোচবিহার,* সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, ২০১৪, পৃ ২৯৩

৪১) দে, ড. দিলীপ কুমার, *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি,* অনিমা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ ৩৯

৪২) দাশ, অভিজিৎ, *তিস্তা উৎস থেকে মোহনা,* এখন ডুয়ার্স , প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ ১৩৮

৪৩) সাক্ষাৎকার, মমিদুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই(বত্তর-চামতা), তারিখ- ২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০১.২০ মিনিট

৪৪) তদেব

৪৫) সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, স্থান-কোচবিহার, সিতাই(বত্তর-চামতা), তারিখ- ২২ ডিসেম্বর,২০১৮ সময়- বিকাল ৩. ২৩ মিনিট

৪৬) সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ- ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- সকাল ১১.২০ মিনিট

৪৭) তদেব

৪৮) তদেব

৪৯) তদেব

৫০) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদক), *উত্তরপ্রসঙ্গ,* হুজুর সাহেব সংখ্যা, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০০৯, পৃ ৪২

৫১) দাশ, অভিজিৎ, *তিস্তা উৎস থেকে মোহনা,* এখন ডুয়ার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ ১৪১

তৃতীয় অধ্যায়: গানের লৌকিক ও সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পর্যালোচনা

কোচবিহার জেলার প্রান্তিক সমাজে এই গানকে কেন্দ্র করে যেমন দ্বন্দ্ব-সমঝোতা দেখা গেছে, তেমনি গানের লৌকিক-সংস্কৃতিক দিকটি লোকগানের জগতে একটা নতুন ইতিহাস গড়েছে। সর্বোপরি এই গানের ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তরেখা নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

ক. অন্তর্জাতিক সীমান্ত প্রতিবন্ধকতার প্রভাব

এই অঞ্চলে রাজবংশী হিন্দু-মুসলিম একটা বড় অংশ সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে। 'কোচবিহারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তরেখা ৪৫৯.৪৫ কিলোমিটার ঘিরে রয়েছে'[১]। সেদিক থেকে কোচবিহার জেলাকে প্রান্তিক জেলা বলা হয়। সীমান্ত বলতে সাধারণত বোঝায়, কোনো দেশের সীমানা সংলগ্ন মানুষের সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক পরাধীন বন্ধন যুক্ত ভূমি। আমরা জানি, ভারত স্বাধীনতার সময় বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই সময় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে সীমান্ত কথাটি তেমন ভাবে জানা ছিল না। বিশেষত ১৯৪৭ সালে এবং পরবর্তী ১৯৭১ সালে এই সীমান্ত শব্দটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলত 'ভারতীয় উত্তরবঙ্গে রয়েছে দার্জিলিং কোচবিহার সহ জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দিনাজপুরের খণ্ডিত অংশ সীমান্তের অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে রয়েছে বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর সহ জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দিনাজপুরের খণ্ডিত অংশ'[২]। বলাই বাহুল্য, যে রংপুরকে বলা হতো রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের হৃদয়পুর তা কোচবিহার জেলা থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। সবচেয়ে দুঃখ জনক ঘটনা হল- রংপুর জেলাতে 'তপশীলি জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিল ৩,৫০,৭৩৫ জন। এই সারে তিন লক্ষ রাজবংশী সারে তিন হাতও জমি পেল না'[৩]। অর্থাৎ তারা সব কিছু হারিয়ে দেশ জাতি সমাজের কাছে উদবাস্তু হয়েছিল। অন্যদিকে '১৯৪৯- এর ২৮শে আগস্ট কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা জগদ্দিপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার 'গ' শ্রেণির রাজ্য হিসাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ঐ বৎসরের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার চিফ কমিশনার শাসিত রাজ্যের মর্যাদা পায়'[৪]।

কার্যত দেখা যায়, সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সীমা ও সীমান্তের বিশেষ সম্পর্ক আছে। বিশেষত সরকারের সীমান্তকেন্দ্রিক আইনের জন্য সাধারণ মানুষদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। 'উত্তরবঙ্গে ভারত-পাক সীমান্তে এই অভিনব সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ভারত সরকার প্রথম উদ্যোগী হয় ১৯৫৮ সালে। এরপর উত্তরবঙ্গের জ্বলন্ত সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ভারত সরকারের দ্বিতীয় উদ্যোগ ১৯৭৪ সালে। ঐতিহাসিক ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি'তে 'তিনবিঘা করিডোর' স্থাপনের

অভিনব সিদ্ধান্ত উত্তরবঙ্গে সৃষ্টি করে নতুন সীমান্ত সমস্যা'[৫]। পরবর্তীকালে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে নতুন নতুন আন্দোলন বা সংগঠনের উদ্ভব হয়। বিশেষত সাধারণ মানুষ সীমান্ত কঠোর আইনের দ্বারা বারবার সমাজ জীবনে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, রাত্রি বেলা কোনো মানুষ বাড়ির বাইরের গেলেই বি. এস. এফ এর অনুমতি নিতে হবে।

> বি. এস. এফ এর অত্যাচারের কাহিনির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ২০০১ সালের ঈদের নামাজের দিনে ২ ভারতীয় হত্যা। সেই হত্যার জেরে হরতাল, মিছিল, শেষ পর্যন্ত মৃতের আত্মিয়দের সাহায্যের ঘোষণা। হলদিবাড়ি ব্লকের ঝাড়সিঙ্গেরস্বর, জিগাবাড়ি, চিলাহাটি মোড়, সিজারহাট, ফিরিঙ্গীর ডাঙ্গা , হুদুম ডাঙ্গা, ডাঙা পাড়া, এই ৭ তি বর্ডার পয়েন্টে সীমান্ত সমীক্ষা করে মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ে। সীমান্তবাসিরা লিখিত ভাবে তাদের সমস্যা তুলে ধরে কৃষি মন্ত্রী কমল গুহর কাছে। দমবন্ধ করা অবস্থায় সীমান্ত জুড়ে প্রায় জেলখানায় বন্দী জীবনে ক্লান্ত বিদ্ধস্ত সীমান্তবাসিরা যত অভিযোগ জানালো তা লিখলে মহাভারত হয়ে যাবে'[৬]। এগুলি ছাড়াও ছিটমহল সমস্যাকে কেন্দ্র করে তিন বিঘা করিডোর সমস্যা, আড়াই বিঘা করিডোর তেতুলিয়া করিডোর দাবী এবং এসব সমস্যাকে কেন্দ্র করে বেরুবাড়ী আন্দোলন, ছিটমহল উদ্ভবাস্তু আন্দোলন, কাঁটাতারের বেরা বিষায়ক আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে[৭]।

এই ঘটনার গুলির মাধ্যমে আমরা এক মানব যন্ত্রনা এক করুন ইতিহাস লক্ষ করছি। এগুলির মধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল ছিটমহল এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। তাই সীমান্ত বেঁধে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনে একটা ভিন্ন ধারা বেঁধে দিয়েছে। যা তাদের জীবন-জীবিকার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে।

অন্যদিকে বিভাজনের পরবর্তী সময়ে ভারতের অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলার মতো পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল উদবাস্তদের আগমন হয়েছিল কোচবিহারে। উদ্‌বাস্তু ও আর্থিক সংকটের মতো সমস্যা দেখা দিলেও বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে সাধারণ মানুষের পূর্ব বাংলায় গমন করা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে পূর্বে আগত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়েরা নিজেদের সংস্কৃতিই পালন করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজবংশীর সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে, যেটা স্থানীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিতে নানা ভাবে প্রভাব ফেলেছে-

> ১৯৫০ এরপর থেকে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের পরিবর্তন, অর্থনীতিকে সরাসরি ভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হতে

থাকে। ভূমিতে টান পরতে থাকে'[৮]। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই রাজবংশী জোতদারা উত্তরবঙ্গে বহিরাগত মানুষদের কাছে তাদের চিরাচরিত অর্থনৈতিক আধিপত্য হারাতে শুরু করেন। আবার সেই বহিরাগতরা রাজবংশীদের জাত, সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি খাদ্য ভ্যাস পোশাক, ঘরবাড়ি ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রুপ করে। ফলে স্বাভাবিক কারনেই তাঁর বিরুপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। এই ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে উত্তরখণ্ড, কামতাপুর ইত্যাদি রাজনৈতিক আন্দোলনের[৯] ।

অন্যদিকে এই অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট মুসলিমরা যেমন 'আব্বাসউদ্দিন, খান চৌধুরী আমানতুল্যা, আনছারউদ্দীন আহমেদ, বজলে রহমান, মকবুল হোসেন'[১০] প্রমুখ দেশ ভাগের সময় চলে যান। ফলে কোচবিহারের মুসলিম সমাজ যেমন একদিকে বিশিষ্ট অভিভাবকদের হারিয়েছেন তেমনি সংস্কৃতির জগতে একটা এর প্রভাব ব্যাপক ভাবে পড়েছিল। উল্লেখ্য যে, এক সময় এই অঞ্চল থেকে বহু লোকশিল্পীর কোচবিহারে গানের আনন্দ দিতে আগমন হত। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। জারি গানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব এড়িয়ে যায়নি। আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি বর্তমানে যারা জারি গান করেন তারা নানা সময় ওপার বাংলায় গিয়ে গান শিখে এসেছিলেন। অন্যদিকে পূর্ব বাংলা থেকে যারা জারি গান করতে আসতেন তারাও সীমান্তের গণ্ডির কারণে আর পরবর্তীকালে আসলেন না। কার্যত জারি গানের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এতে কোচবিহারের মুসলিম সমাজের সংস্কৃতিতে একটা বিরাট আঘাত হেনেছিল। স্থানীয় মুসলিমদের অভিমত- মহরমের দিন তারা এই অঞ্চলে এসে মহরমের জারি করতেন। এমনকি দুই দলের মধ্যে একস্থানে আয়োজন করে জারি গানও শোনা হয়েছিল। তাছারাও তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে জারি গান করতে আসতেন। ফলে বলা যায়, এই অঞ্চলে জারি গায়কদের উপর তাদের গানের প্রভাব পড়েছিল। ধীরে ধীরে এই অঞ্চল জারি গান স্বতন্ত্র জারি গানে পরিণত হলেও আজও পূর্ব বাংলার জারি গানের বহু চিহ্ন লক্ষিত হয়। বিশেষ করে মারফতি, দেহতত্ত্ব অংশের গান ছাড়াও দীর্ঘ আকারে কাহিনি ভাবনা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের খাইয়া রে, যাইয়া রে এর প্রভাব স্পষ্ট ভাবে রয়েছে। তাছাড়াও বর্তমানে যারা জারি গান করেন তারা বেশিরভাগ বয়াতি এই অঞ্চলের সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করছেন। তাদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও সীমান্তের প্রতিবদ্ধকতার প্রভাব এড়িয়ে যায়নি। ফলত নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীনের মধ্য দিয়ে তাদের জারি গান করতে হয়।

সাধারণত আমরা দেখা যায়, কোচবিহারের মুসলিম সমাজে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বিষয়টি নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এমনকি তাদের প্রান্তিকতার শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং দারিদ্রতা নিবারনের জন্য উপযুক্ত কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তাই ক্ষণিকের জন্য হলেও শোকের গান শুনে চোখের জল ঝরিয়ে মাধ্যমে নিজেদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করে।

খ. গানের লৌকিক ও সাংস্কৃতিক দিক

কোচবিহারে অধিকাংশ রাজবংশী সমাজের মানুষের বসবাস। এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ বলতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়। মুসলিম সমাজের সঙ্গে রাজবংশী কথাটি যুক্ত আছে তা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তারা বর্তমানেও প্রান্তিক সমাজের পরিচয় বহন করে। ফোক্-কমিউনিটি সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে-

> It is people of common background-social, economic, ethnic, sectional urban, rural, mountainous, occupational. The background must have devel- oped over a period of generations so that thay are well set in the mind of the graup. To common backgrounds are added common goals, interests and val-ues and the most of all, common pressureses. From backgrounds and common goals and awareness of common pressures evolves a common psychology. Also there must be a neet for expression, a common language-whether in words, instruments, dances art pieces or some other devices......[১১]

সেদিক থেকে কোচবিহারের মুসলিমরা বিশেষত ভাষা, সমাজিক-সংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফোক্-কমিউনিটি এর পরিচয় বহন করে। এই সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পালা আকারে জারি গান লোকগানের-ই মর্যাদার অধিকারি। লোকসঙ্গীত অর্থে এককথায় জীবনের গানকে বোঝায়। 'ইংরাজি ভাষায় ফোক্ সঙ্- এর বঙ্গীকৃত হলেও সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থে তাৎপর্যবাহী। এর উৎসহ

গ্রামের জল, মাটি, হাওয়া। এর মধ্যে পরম্পরাগত শব্দ ও সুরের ঐতিহ্য, যাকে ভিত্তি করে গ্রামীণ সংস্কৃতি ধারাবাহিকতার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। '১৯০৭ সালে Cecil shap লোকসংগীত সম্বন্ধে বলেছেন- the spontaneous music of the unspoiled, unlettered classes and created out of their pure natural instinct.' Sharp প্রদত্ত সূত্রকে ভিত্তি করে ১৯৫৪ সালে ব্রাজিলের সাওপোলোতে অনুষ্ঠিত 'International Folk Music council' লোক সংগীতের সংজ্ঞা দিয়েছেন- Folk Music is the product of musical tradition that has been evolved through the process of oral transmission'[১২] বলাই বাহুল্য এই গান অনেক বিবরণ-পরিবর্তনের পথ অতিক্রম করে স্থায়িত্ব লাভ করে। বিশেষত মহরমের জারি গান থেকে কিছুটা সরে এসে প্রান্তিক মুসলিম সমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা সুখ-দুঃখ প্রভৃতির কথাই জারি গানের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই গানের ভাবধারা গতি প্রকৃতি বোঝার সুবিধার্থে আঞ্চলিক ভাষাতে রচিত। গানের ভাষার ক্ষেত্রে তারা বেশিরভাগ সময় স্থানীয় ভাষার শব্দ যেমন- কালা, চিকনকালা, বাওয়াই, ময়না, ছওয়া-পোওয়া ইত্যাদি ব্যবহার করলেও পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ভাষা- খাইয়া রে, যাইয়া রে ব্যবহার করে। এছাড়াও বয়াতিরা অনায়াসেই গানে ব্যবহার করছেন আরবি-ফার্সি শব্দ তথা আল্লাহ, *কোরান,* মক্কা, মদিনা প্রভৃতি। তবে বয়াতিরা স্থানীয় ভাষার উপর বেশি জোর দেন। তার প্রমাণ প্রত্যেকটি গানের মধ্যে কম-বেশি লক্ষ করা যায়।

এই গানের প্রথম অংশ হল বন্দনা গান। যেখানে অবলীলাক্রমে স্থানীয় কুশান, সাইটল, চারযুগের পালা গানের মতো বন্দনা করা হয়। এই বন্দনা রীতি বহু প্রাচীন। এই গানের বন্দনা রীতির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, এটা প্রান্তিক অধিবাসীর লোকগান। যা লোকগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অংশের গানের মধ্যে আল্লা, নবীজি, হাসান-হোসেন আলী-ফাতেমা শিক্ষাগুরু, পিতা-মাতা প্রমুখকে সালাম বা ভক্তি জানানো হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ পাই।

গানের বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যে লক্ষ করা যায় প্রথমে বন্দনা তার পর ঐতিহাসিক কাহিনির সঙ্গে মিল রেখে সামাজিক, দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড লোকগান যুক্ত করে পরিবেশিত। যা সারি, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি লোকগানে দেখা যায় না। অর্থাৎ বয়াতিরা গানের বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন। আবার যে সব

ঐতিহাসিক কাহিনি বর্ণিত হয়, সেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে মিথ ও মটিফ রয়েছে। গানের গল্পগুলি এই অঞ্চলে পুরুষানুক্রমিক অনুসারে প্রান্তিক মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

প্রত্যেকটি পালায় দেখা যায়, গানের শেষে বা মাঝে বয়াতিরা গানের চরিত্রের যখন চরম দুর্দশায় পৌঁছায় তখন বিষহরী গানের মতো গানের আসরেই সেই চরিত্রদের উদ্দেশ্যে দান চাওয়া হয়। যেখানে একটি লোকাচারের ঐতিহ্য বহন করছে।

অন্যদিকে গানের সময় ব্যবহৃত হয় সরাজ বা দোতরা ঝুরি, জিবসি, ঢোল, আনেক সময় বাঁশি, প্রভৃতি ছাড়াও কেসিও এর উপস্থিতিতে আধুনিকতার প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যদিকে বয়াতিদের শরীরে বেশিরভাগ সময় পাঞ্জাবি-পায়জামা, কেউ কেউ মাথায় সাদা পাগরি পরিধান করে।

সাধারণত গানগুলির তেমনভাবে কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায়না। গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারা অনুসারে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে। যা লোকগানের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। আর এই গানগুলির যারা অধিকারি তারা অধিকাংশ নিরক্ষর। পুঁথিগত শিক্ষা নেই বলতে চলে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গানেরও নানা অংশের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- 'আইব নবী' পালায় বর্তমানে চাঁদের হাহাকার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য রেখে গান করা হয়। বিশেষত স্থানীয় লোকগান ভাওয়াইয়া, কুশান, বিষহরী প্রভৃতি গানের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যা লোক সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যেও দেখা যায় স্থানীয় সমাজ ভাবনার প্রতিচ্ছবি।

ইসমাইল কুরবানি

এই পালাটি শুরুতে বর্ণনা আছে ইব্রাহিমের সুখ-দুঃখ জীবনের ঘটনা। তবে ইব্রাহিম হাজরাকে দ্বিতীয় বিবাহ করলে শুরু তাদের জীবনে দুঃখের কাহিনি। প্রথমপক্ষের স্ত্রী ছায়রা বিবির হাতে হাজেরা নানা ভাবে একের পর এক অত্যাচারিত করে এবং সংসারে অশান্তি সূত্রপাত ঘটে। বিশেষত হাজেরার বনবাস এবং সেইখানেই

ইসমাইলের জন্ম হয়। কাহিনি অংশে ইসমাইলের নাম থাকলেও হাজেরার দুঃখই বেশি দেখানো হয়েছে।

এই পালায় দেখা যায়, ইব্রাহিম পুত্র শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে জমজম কুয়ার আবির্ভাব হয়। কাহিনির পরিশেষে ইসমাইলকে যখন তার পিতা কুরবানি দিয়েছিল তখন তার স্থানে অলৌকিক ভাবে দুম্বা কুরবানি হয়। এই কাহিনির মধ্যে এই ধরনের নানা মিথ দেখা গেলেও সেই সঙ্গে রয়েছে নানা মটিফ। যেমন– ইব্রাহিম এবং হাজরার বিবাহের ঘটকের উপকাহিনি, হাজরার বনবাসকালে হঠাৎ সওদাগরের আগমন, ইসমাইলকে বাঁচানোর জন্য সর্গ থেকে জিবরাইল পাঠানোর কাহিনি প্রভৃতি মোটিফ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও এই কাহিনির মধ্যদিয়ে বর্তমান সময় অনুসারে প্রান্তিক সমাজের দৈনন্দিন বাস্তব চিত্র দেখা যায়। যেমন- দুই সতীনের দ্বন্দ্ব, হাজারার নাকে ফুল কানে দুল দেওয়া, স্বামী ছাড়া নারীর বেদনা, সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য বা প্রেম, মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র, দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া-দাওয়ার প্রথা পালন ইত্যাদি প্রান্তিক সমাজেরই দর্পণ।

শহীদ কারবালা

এই অঞ্চলের বয়াতিরা শহীদ কারবালার কাহিনির শুরুতে রয়েছে, ইয়াজিদের চক্রান্তে বিবি জাহেদা বা জয়নব দ্বারা হাসানের বিষপানের ঘটনা। কাহিনিটির মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়, হাসানের পরিবারের সদস্যরা যেদিন নিমন্ত্রণ খেতে যায়, সেইদিন জয়নব হাসানকে চক্রান্ত করে বিষপান করান। হোসেন বাড়িতে ফিরে আসলে দাদার মরা দেহ লক্ষ করে মাটিতে পরে কান্নাকাটি শুরু করেন। এ দেখা যাচ্ছে, একজন বীর চরিত্রকে প্রান্তিক সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে মিশিয়ে বয়াতিরা বর্ণনা করেছে। অন্যদিকে জয়নবকে দেখানো হয়েছে ঘর শত্রু বিভীষণ অথবা ডাইনী চরিত্র হিসাবে। হোসেনের শিশু সন্তান

অসগর শত্রুর তীরে মৃত্যু ঘটলে মায়ের হাহাকার গ্রামীণ সমাজের সন্তান হারানো জননীর কথা চিত্র ফুটে উঠেছে।

উল্লেখ্য যে, হোসেনের মৃত্যু কি ভাবে হবে তা পূর্বেই হজরত মহাম্মদ ভবিষ্যৎ বাণী করেছে। তাই দেখা যায় হজরত মহাম্মদের কথা মতো হাসানের মৃত্যু ঘটে। হোসেন যখন কুফায় পথে কারবালার মাঠে পৌঁছায় তখন লক্ষ করে অস্বাভাবিক ভাবে ঘোড়ার পা ডুবে যায় এবং রান্নার জন্য শুকনো গাছ কাটতে গেলে সেই গাছ থেকে রক্ত বের হয়। কাহিনির পরিশেষে ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে শিমরের হাতে হোসেনের মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও জয়নাল আবেদিনের চিঠির সূত্রে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। আবার এই কাহিনিতে নানা মটিফ লক্ষ করা যায়, হজরত মহম্মদের কাহিনি, কাসেম-সকিনার কাহিনি, জয়নাল- হানিফের গল্প ইত্যাদি।

অন্যদিকে সকিনার বৈধব্য জীবনের কষ্ট এই অঞ্চলের বাল্য বিধবার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই কাহিনির সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য চরিত্র হল হোসেন। যিনি ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন কুরবানি দিয়েছেন। বয়াতিদের কথা অনুসারে, যখন হোসেনের মৃত্যু ঘটনা গানের আকারে বর্ণনা করা হয় তখন উপস্থিত শ্রোতারা চোখের পানি ফেলে দুঃখ প্রকাশ করে। অন্যদিকে একসময় সেই বীরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে হানিফা। এতে প্রান্তিক সমাজের মানুষের মনে শান্তি অনুভব করে। কাহিনির বেশিরভাগ চরিত্রগুলির চাল-চলন প্রান্তিক সমাজের মানুষেরই পরিচয় বহন করেছে।

মোসলেম পালা

মোসলেম পালা শহীদ কারবালার ঘটনার অংশ হলেও আলাদা পালা হিসেবে দেখানো হয়। তাঁর চরিত্রটি হোসেনের সমসাময়িক বীরত্বের দাবী রাখে। মোসলেম তার দুই পুত্র সঙ্গে নিয়ে কুফার পথে যাত্রা। সেই পথে মহাম্মদ এবং ইব্রাহিম নানা ভাবে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার স্বীকার হয় এবং হারেজ পাপির স্ত্রী নিজের সন্তান মতো কোলে তুলে নেয়।

এর মধ্য দিয়ে সন্তান বাৎসল্যর পরিচয় পাই। অন্যদিকে একসময় মহাম্মদ এবং ইব্রাহিম হারেজ পাপীর হাতে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু ঘটে এবং বহু নদী-নালায় ভেসে গেলেও তাদের শরীর সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। ফলত, আব্দুলা জেহাদের চক্রান্তে মোসলেমের মৃত্যুর চাইতে তার শিশু সন্তান দুটির মৃত্যুই সাধারণ মানুষকে বেশি করে ভাবিয়ে তোলে। এই পালাটি শুরু এবং পরিসমাপ্তিও ঘটেছে শোকের ঘটনার মাধ্যমে।

আইব নবী পালা

এই পালায় চাঁদসওদাগরের মতো আইব নবী জীবনেও অস্বাভাবিক ভাবে শয়তান একে একে ১৮টা গজব দেয় আল্লাকে ভুলে থাকার জন্য। প্রথমে- যত জাহাজ ছিল সব ডুবে যায়, দ্বিতীয়- জমি জায়গা মরুভূমিতে পরিণত হয়, তৃতীয়- বাড়ি ঘর পুরে গেল, চতুর্থ- এগারোটি পুত্র হারান, পঞ্চম- আইব নবীর শরীরে ঘা দেখা দেয়, ষষ্ঠ- সব কিছু হারিয়ে বিবি রহিমাকে নিয়ে বনে বাস করতে শুরু করে পরিশেষে হারানো সব কিছু ফিরে পান। মটিফগুলির মধ্যে রয়েছে, গ্রামবাসীর কুষ্ঠ রোগের ভয়, বনেবাস করার সময় শিমূল, জিগা, সুরমানা, লেবু ইত্যাদি গাছের কথা। এখানে প্রান্তিক জমিদার মুসলিমের পারিবারিক চিত্র, খরা-বন্যা, দুর্ভিক্ষয়, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি বাস্তব সমাজচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

জাবেরের দাওয়াত

এই পালাটি শুরু হয়, সাতদিনের অনাহারে থাকা নবীজির দুঃখের জীবনী বর্ণনা মাধ্যমে। কিন্তু দয়ার নবীজি নিজে সাতদিন অনাহার থাকা সত্ত্বেও নাতিদের জন্য খেজুর সংগ্রহের জন্য বেড়িয়ে পড়েন। কিন্তু খেজুর সন্ধান করতে গেলে তিনি খেজুর বাগানের

মালিকের কাছে চরম লাঞ্ছনার স্বীকার হন। কাহিনির এই অংশ কষ্ট ও দারিদ্রতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে এই কাহিনির মধ্যে রয়েছে নানা অলৌকিক ঘটনা। যেমন- সওদাগরের অলৌকিক ভাবে কাঁটা হাত জোড়া লাগে, জাবেরের মৃত শিশুপুত্র জীবিত এবং রান্না করা মাংসের হার থেকে পুনরায় জীবিত হয়। এই কাহিনির মটিফ গুলির মধ্যে অন্যতম হল সওদাগরের মায়ের গল্প, আজরাইলের গল্প ইত্যাদি। ধনীর ছেলে গরিবকে ভালবাসে না, ধনী ব্যক্তির কাছে যে গরীব মানুষ হাতের খেলনা, দারিদ্রতা, শিশুদের খেলা করার চিত্র, নিমন্ত্রণ পালন প্রভৃতি স্থানীয় বাস্তব সমাজচিত্র লক্ষ করা যায়।

আবুমুছা জঙ্গি

এই পালাটি শুরু হয় আবুমুছা উজু করার জন্য নদীর পারে গেলে, নদীতে ভেসে যাওয়া একটা খেজুর ফল দেখে ভুল করে খেয়ে নেয়। তার মনে হয়, অন্য মানুষের ফল না বলে খেয়ে, পাপের কাজ করেছে। তাই তিনি সেই ফলের মালিককে খুঁজতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত মালিকের দেখা পেলে, তিনি বিস্তারিত ভাবে সেই ঘটনা খুলে বলেন। ফলে, বাগানের মালিক তাকে বারো বছর খেজুর গাছে জল ঢালা কাজ দেয় এবং পরবর্তীকালে তার মেয়ের সঙ্গে আবুর বিবাহ দেয়। কাহিনির এই অংশে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। একই সঙ্গে অলৌকিক ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বড়পীর আব্দুল কাদের মায়ের পেট থেকে অস্বাভাবিক ভাবে বাইরে এসে বাঘের রূপ ধরে শয়তান এবং সাপের হাত থেকে মাকে রক্ষা করে। এছাড়াও মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় অলৌকিক ভাবে *কোরান* শেখে। এই কাহিনির মটিফগুলি হল- বাঘের গল্প, সাপের গল্প, ফকিরের গল্প প্রভৃতি। ঘরজামাই চিত্র, ধনী মানুষের স্বভাব, ভণ্ড ভিখারীর স্বভাব, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বাস্তব চিত্র লক্ষ করা যায়।

কুলসুমের মেজবানি

এই পালায়, কুলসুম ধনীর অহংকার করার ফলে তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ অলৌকিক ভাবে শেষ হয়ে যায়। ফাতেমা, হাসান-হোসেন দোয়া করার ফলে পুনরায় সেগুলি ফিরে পায়। এছাড়াও এই কাহিনির মধ্যে দারিদ্রতা, ধনীর অহংকার, দাওয়াত পালনের চিত্র ইত্যাদি বাস্তব সমাজ চিত্র লক্ষ করা যায়।

বেল্লালের জীবনী

এই কাহিনির শুরুতে বেল্লালের জীবন দারিদ্রতার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হতে দেখা যায়। এমনকি তাঁর মা অভাবের কারণে তাঁকে জমিদারের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। ফলত, তার জীবন চরম দারিদ্রতা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে। এর উপর আল্লাহ তাকে মাত্র সাতদিনের হায়াদ করে দেয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম মতে, বিবাহ না করে মৃত্যু হলে জান্নাতে জায়গা হয় না। ফলত কাঠুরিয়ার মেয়ে রাবেয়া সঙ্গে বিবাহ হয়। এই পরিস্থিতিতে পাগল ওয়াজকরনি তার মায়ের পেটের খিদে নিবারণ করার জন্য বেল্লালের বাড়িতে প্রবেশ করে। পাগল আল্লাহ'র কাছে দোয়া করলে বেল্লালের সাতদিনের হায়াদ থেকে সত্তর বছর হয়। এই কাহিনির মধ্যে যেমন অলৌকিক ঘটনা আছে তেমনি সমাজ বাস্তবতা পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ করা যায়। এই পালায় আজরাইল গল্প, ওয়াজকরণীর আগমন, বেল্লালের সাতদিনের হায়াদ বা সত্তর বছরের হায়াত লাভ করা প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই কাহিনিতে বেল্ললের জীবনের দারিদ্রতা গ্রামীণ সমাজের আঙিনার ফুটে উঠেছে।

মনছুর হাল্লাত

এই বেল্লালের জীবনের মতো মনছুর ও তার ছোট বোন আয়না জীবনও একই রকম দারিদ্রতার চিত্র রয়েছে। কাহিনির প্রথমদিকে দেখা যায়, মনছুর ও আয়না দুঃখ- কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় বড় পীর আব্দুল কাদের জেলানির চায়। কিন্তু পথে প্রচণ্ড বন্যার ফলে জলের ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে এক কাজী এসে তাদের বাঁচিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। কাজী বাড়িতে তাদের দ্বারা চাকরের কাজ করিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় মনছুর ও আয়নার দুঃখের শেষ থাকে না। অন্যদিকে দেখা যায় কাজির মেয়ে সবুরা সঙ্গে মাদ্রাসায় গিয়ে গোপনে *কোরান* শেখে এবং বাড়িতে এসে মনছুরকে তা শেখায়। কাহিনির এই সব ঘটনা সামাজিক বাস্তবতার পরিচয় বহন করলেও কিছু অলৌকিক ঘটনার পরিচয় মেলে। যেমন- সবুরা ফুলের ঘ্রান গ্রহণ করলে কুমারি অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়, ছাই থেকে মানুষের আওয়াজ, মানুষের শরীরের নোংরা থেকে গাছ জন্মানো প্রভৃতি অলৌকিকতার পরিচয় বহন করে।

এইভাবে প্রত্যেকটি কাহিনিতে এই ধরনের মিথ এবং মোটিফ সেই সঙ্গে বাস্তব সমাজ চিত্রও লক্ষ করা যায়।

> সংস্কৃতি বিজ্ঞানী গোমো বলেছেন- যথার্থভাবে বিজ্ঞানিচেতনা সৃষ্টি হবার আগেও মানুষের মনে যে কার্যকারণের সম্বন্ধ একটি প্রবণতা ছিল, এই কাহিনি গুলি সেটিই প্রমাণ করে। তাই আপাত দর্শনে লোকপুরানকে যতই অবাস্তব, অলৌকিক, বা অসম্ভাব্য বলে মনে হোক না কেন, তারই গভিরে লুকিয়ে থাকে বাস্তব অভিজ্ঞানের রেনু এর বাস্তবের একান্ত স্পর্শ থাকে বলেই সময়ের বিবর্তনে মিথের রূপ পরিবর্তিত হলেও তাঁর প্রত্ন কাঠামোটি একই থাকে। আর কাল থেকে কালান্তরে মিথের অভিজাত মানুষের অন্তলোকের গভীরে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে[১৩]।

কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বর্তমান উত্তর আধুনিকতার যুগেও তারা এই মিথগুলি দিনের পর দিনের বিশ্বাস করে। কখনই তারা এগুলিকে অবাস্তব বা রূপকথা ভেবে উড়িয়ে দেয় না। বরং এই মিথগুলির মধ্য দিয়ে প্রান্তিক সমাজের মানুষ বেঁচে থাকায় আশা খোঁজে।

অন্যদিকে কাহিনির মোটিফগুলিও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে প্রান্তিক লোক-সমাজের মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে।

> স্টীম টমসন মোটিফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- লোককথার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ এককই হল মোটিফ। অসাধারণ বা আকর্ষণীয় মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসেবে ঐতিহ্যের মধ্যেও যা বেঁচে থাকে এবং কথকের প্রভাবে বা কালের প্রভাবেও যার পরিবর্তন হয় না'[১৪]। 'মোটিফ শব্দটি ফরাসী ভাষা থেকে গৃহিত। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনী-ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনী-অংশ পাওয়া যাবেই, সেই কাহিনী-অংশ বা কাহিনী-অংশ সমূহকে টমসন মোটিফ বলেছেন। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনী অংশ সমগ্র কাহিনীকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে[১৫]।

এই অঞ্চলের জারি গানের ঘটনাগুলির সঙ্গে মোটিফ দেওয়া বৈশিষ্ট্য গুলির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, মানুষের ভাষা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, লোকবিশ্বাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে কিছুটা আলাদা হলেও সর্বস্তরের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি পালনের ক্ষেত্রে একই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, এই লোক-গল্পগুলি মানসিকতার সেতুবন্ধনের কাজ করে। তাই দেখা যায়, আরবের ঐতিহাসিক গল্পের মিথ এবং মোটিফগুলি হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের মানুষের লোকজ উপাদান। অর্থাৎ লোক-সমাজের উদার মন কখনোই কোনো রকম ধর্ম-জাতি সীমান্তের ব্যবধান মানে না। অন্যদিকে আমরা যদি এর প্রান্তিকতার খোলস ছাড়িয়ে ফেলি তাহলে দেখবো লোকসংস্কৃতির জগতের এক সার্বজনীন আভিপ্রায়ের রূপ। ফলত এগুলি একইসঙ্গে প্রান্তিক এবং বিশ্বজনীন। এই কাহিনিগুলি মার্কসবাদী তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক-

> মার্কসবাদী লোকসংস্কৃতিবিদরাও তাদের চর্চার প্রয়োগ করেন ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব-পদ্ধতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মার্কস এঙ্গেলসের শ্রেণী সংগ্রাম এর তত্ত্ব, যে তত্ত্ব বলে যে আজ পর্যন্ত জানা যে সামাজিক ইতিহাস তা বস্তুত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, অর্থাৎ বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির ইতিহাস[১৬]। তারা সামাজিক প্রগতির দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এক, লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা ও বাহক শুধুই কৃষক নন, সব গোত্রের শ্রমজীবী, গ্রামে বা শহরে, কৃষিতে বা কারখানায়। আর দুই, তা শুধু অতীতের বস্তু নয়, সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে লোকসংস্কৃতি তৈরি হয়ে থাকে, অতীতে

যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি হয়ে থাকে বর্তমানেও। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা পৌঁছান ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রে, যার ভিত্তি দ্বন্দ্ব মূলক বস্তু বাদের মার্কসীয় তত্ত্ব[১৭]।

আলোচিত প্রথম অধ্যায়ে প্রান্তিক সমাজের সমাজ-ইতিহাস, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ও জীবন সংগ্রামের নানা কথা বললেও এখন বিশেষত গানের মধ্য দিয়ে তা আবার সেই প্রসঙ্গ দেখানো হবে। এই প্রসঙ্গের একটি গানের উল্লেখ করা হল, যেখানে সরাসরি শ্রেণী সংগ্রামের চিহ্ন উপস্থিত রয়েছে-

'ওরে এই ভব সংসারে গরীবের কেউ ভালবাসে না

ধনী চেনে ধনী রে, গরীব চেনে গরীবেরে

গরীব যদি ধনীর বাড়ি যায় কথা কয় না।

এই দুনিয়ায় গরীবের কেউ ভাল বাসে না।

বড় লোকের পায়ের জুতা গরীব লোকের চামরা

বলতে পার বড় লোক মটরে কেন চরে?

সেই মটরের চাপায় গরীব কেন মরে?

বড় লোকের মেয়েদের যেমন আজব রঙ্গয়ের গয়না

গরীব লোকের মেয়েরা হইলেন তাদের হাতের খেলনা।

ওরে এই ভব সংসারে গরীবের কেউ ভালবাসে না'[১৮]।

আবার কোথাও কথার ছলে বলা বলে-

দালান কোটা সুন্দর বাড়ি আর আছে তোর সুন্দর নারী সঙ্গে কেউ তোর যাবে না

আর কত কাল খেলবি খেলা মরণ কি তোর হবে না

আই দেহা তোর পরিপাঠি হেন্দু মরলে যায় গাঙ্গের পাঠি

মোসলমানকে দিবে মাটি জাইতে হবে খালি খালি সঙ্গে কেউ যাবে না

আর কতকাল খেলবি খেলা মরণ কি তোর হবে না[১৯]।

গানের বেশিরভাগ ঘটনার নায়ক-নায়িকাদের চরম দারিদ্রতা হিসেবে অঙ্কন করা হয়েছে। এমনকি মহানবী হজরত মহাম্মদ থেকে শুরু করে হাসান-হোসেন, আলী-ফাতেমা, হজরত বেলাল, মনছুর হাল্লাদ প্রমুখ সবাই দারিদ্র এবং চরম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা স্বীকার। এই প্রসঙ্গে একটি গান-

১)ওরে কতই দুঃখ দিবি রে দয়াল
ওরে তুমি আর দুঃখ দিয় তুমি
ওরে আমার সইবার মতো জায়গা দিয়া
আমারে সাগরে ভাসাইও রে।
যার কপালে যা লেখা আছে রে
ওরে দুঃখ কান্দিলে কি খণ্ড কি হবে'[২০]।

২) 'ওরে হজরত বেল্লাল বাল্য কালে তাঁর আব্দুল রহিম ছিল,
হঠাৎ বাবা ওই না মারা গেল, মা জননী ওই না সন্তান কে লইয়া
কিবা উপায় করে, আট গরীব ছিল তাঁর জায়গা জমি ছিল না রে।
ওরে কাটরিয়া বলে পরিচয় ছিল বেল্লালের বাবের ভাই,
জংলে কাট কাটতে গিয়া মারা গেছে ভাই।
ওরে মা দুঃখিনী সন্তানকে লইয়া ঘুরিয়া বেরায় রে
যার কপালে যা লেখা আছে রে'[২১]। (আইব নবী'র পালার প্রথম অংশ)

এই গানগুলির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। যা কোচবিহারের প্রান্তিক সমাজের বাস্তব চিত্র বলা যায়। ফলত, এই গানের প্রতি তাদের এক ধরনের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর অবচেতন মনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার সময় পুরাণ, লোককথা, সামাজিক

নিষেধাজ্ঞা, সংস্কার ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর স্বপ্নতত্ত্বের মূল ভিত্তি মানুষের মনের অবচেতন স্তর এবং তার শৈশবের সুপ্ত যৌন হল ব্যক্তির পুরাণকথা বা মিথ'[২২]। অর্থাৎ আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি, এই অঞ্চলে প্রচলিত মিথগুলি যে পরোক্ষভাবে প্রাত্যহিক জীবন-যাপন, সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদির বাস্তব দলিল ও চিত্র বহন করছে। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 'গান হল মনের ভাবনা। মানুষ যখন বিরাট কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সাধারণ সংলাপের মাধ্যমে সেই ভাবনাকে বোঝানো যায় না, তখনই এসে গান-নিঃশ্বাসের মতো স্বচ্ছন্দ হয়ে। স্রোতের জলে-ভাসা ভ্রুকুচির মতো ভাবনাগুলো ইতিউতি যেতে চায়। আনন্দ হলে, ভয় ধরলে, দুঃখ পেলে মানুষের ভাবনারা এক শক্তির প্রবাহে বহে চলে'[২৩]। ফলত, গানগুলি মাধ্যমে আমরা কোচবিহারের প্রান্তিক সমাজের একটা নতুন ইতিহাসের সন্ধান খুঁজে পাই। যেটা লিখিত না হলেও বর্তমান সময়ে এর অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে।

গ. গানের ধর্মীয় মতাদর্শ: দ্বন্দ্ব ও মেলবন্ধন

কোচবিহারের মুসলিম সমাজে প্রচলিত জারি গান যেমন একধরনের লোক-ইসলামের উল্লেখ করেছে, তেমনি তাকে কেন্দ্র করে সমাজে উদ্ভব ঘটছে দ্বন্দ্ব সমঝোতা এবং মিলন ক্ষেত্র। বিশেষত বন্দনা গানটিতে লোকধর্মের একটা উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। আল্লাহ'র পাশাপাশি ফাতেমা, হজরত আলির হাসান-হোসেন প্রমুখের কথা বলা হয়। যার মাধ্যমে জারি গান যে কারবালার ঘটনাকেন্দ্রিক গান তার পরিচয় পাওয়া যায়। পীরের প্রতি স্মরণ রাখার মাধ্যমে বোঝা যায়, এই সমাজে যে পীরবাদের প্রভাব রয়েছে তারই চিহ্ন বহন করছে। অন্যদিকে গানের শিক্ষা গুরুর প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে, এই গানে মুর্শিদি গানের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এরপর গানের শ্রোতা কিছু সংখ্যক হিন্দু থাকার জন্য বন্দনার শেষের অংশে-কুষাণ, বিষহরী, মনসা, দোতরাডাঙা পালা, চারযুগের গান প্রভৃতি পালাগানের বন্দনা রীতি অনুসারে গান করেন। এছাড়া পিতা-মাতাকে বন্দনার মাধ্যমে গায়কের ব্যক্তিগত আকুতি প্রকাশ হয়। এই গানটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে লোক-ইসলামের পরিচয় পাই।

> লোকধর্ম অভিজাত ধর্মের পাশেপাশে গড়ে ওঠে। এর প্রাণবীজ থাকে লৌকিক জীবনে ও লোকায়ত যাপনে। আমাদের দেশে বেদ-ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্র অনুশাসিত যে অভিজাত ধর্ম তার সমান্তরাল কিংবা প্রতিবাদে নানা যুগেই নানা লৌকিক ধর্ম গড়ে উঠেছে। সাধারণ ভাবে আঠারো শতকেই বাংলার লোক ধর্মগুলি সুচিত হয়েছিল। সহজিয়া, কর্তাভজা, বাউল, ফকিরীমত, সাহেবধনী, বলরামী, খুশী বিশ্বাসী, লালনপন্থা ইত্যাদি নানা নামে আমাদের বাংলার লৌকিক ধর্মগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে[২৪]।

এক্ষেত্রে কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজে লোক-ইসলাম ধর্মের পরিচয় বহন করছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, নতুন নতুন পীরের মাজার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে কারিশাল অঞ্চলে ২০০৯ সালে নতুন পীরের মাজারের প্রতিষ্ঠা ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাঁরা পীরের উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং স্থানীয় লোকাচার পালনের মাধ্যমে লোকধর্ম পালন করে। তাছাড়াও, সুদূর আরবের মহাম্মদের ১৪০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম তারা কোনো এক সময়ে গ্রহণ করেছে ঠিক কিন্তু পীর বা হুজুররা যে ইসলাম ধর্ম দেখিয়ে গেছেন বর্তমানে তারা সেই পথে চলছে। আরও লক্ষ করার বিষয়, তারা মূল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোক-ইসলাম ধর্ম পালন করছে। এতে তাদের কখনো কোনো ভাবে ভুল অনুভব হয় না। কারণ আমরা জানি, পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আর এক অঞ্চলের সংস্কৃতি ভিন্ন আধিবাসির মানুষের কাছে জোর করে চাপিয়ে দিলেও তা পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে মান্যতা পায় না। কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজেও সেই একই পরিস্থিতি দেখা গেছে। অর্থাৎ তারা বিশেষ এক ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কোনো ভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি পালন করতে ভুলে যায়নি। তার প্রমাণ বন্দনা অংশটিতে লোকায়ত ইসলামের পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই অঞ্চলে মাদ্রাসা বা মোক্তবের ছাত্র এবং ছাত্রীদের শুধু *কোরান*-ই মুখস্ত করানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে *কোরান*-এর বাংলা মানে কখনো তেমন ভাবে বলা হয় না। তাই তাদের শুধুমাত্র পুঁথিগত কোরান-ই মুখস্ত হয় কিন্তু আসল *কোরান* এর অর্থ কি তা এই শিক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারে না। ফলত বয়াতিরা গানের মাঝে মাঝে তত্ত্বমূলক কথা বলেন। যেমন- মানুষ *কোরান* না হইলে কাগজের

কোরান কি কথা কয়। অর্থাৎ মানুষ যতই পুঁথিগত বিদ্যা পাঠ করুক না কেন সেগুলি যদি কাজে না লাগায় তা হলে কোনো লাভ হবে না। এই ভাবনা যখন তারা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন তখনেই মৌলবীদের সঙ্গে তাদের তিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষত যখন তারা স্থানীয় পীরের কথা যুক্ত করে গান করেন তখন মৌলবিদের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্কের স্থাপন হয়।

রূপার টাকা কাগজের নোট দাদা সেদিন নবীর কাছে চলিবে না।

আমার খাজা বাবা চলিয়া যায় নবীজির রওজায়

সেদিন মা ফাতেমা শিকল হইয়া নৌকা ধরিবে, হাল ধরিবে আলী মোস্তফায়।

আমার নবী মোস্তফার ডাইনে বাহে, হাসান হোসেন দুই ভাইয়ে থাকবে বসিয়া

আমার খাজা বাবা মইনদ্দিন আজমিরে পারে নিন।

আমার হলদিবাড়ির একরামুল করে নি তাও ভুল

ফাল্গুনের দশ তারিখে হয় যে তার কাম

হাত্তিয়ায় মাজার আছে বড় পীর ছোট পীর দুইজনা রয়’[২৫]।

এই গানটির মধ্যে স্পষ্ট ভাবে পীরের প্রশংসা করা হয়েছে, যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে শাস্ত্রী ইসলামের বিরোধ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও অন্যান্য খণ্ড খণ্ড গান এবং মূল কাহিনির মাধ্যমে যেভাবে নারীর মনের দুঃখ-কষ্ট চিত্র তুলে ধরে যা গোঁড়া মৌলবীরা কোনো ভাবে মেনে নেয় না। তার উপর আবার নারীদের ঘর থেকে বাইরে এসে পুরুষদের পাশে বসে গান শোনা এবং তাদের অব্যক্ত মনের দুঃখ যন্ত্রণার তুলে ধরা, গানের মাধ্যমে গোঁড়া মৌলবিদের ভণ্ডামির বাস্তব চিত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটা সুন্দর সমাজের স্বপ্নের কথা, প্রান্তিক মানুষের মানবিক আবেদন, গানের মধ্যে বাদ্যের উপস্থিতি ইত্যাদি তাদের বিশেষভাবে অসহ্য করে তোলে। কার্যত তারা অভিযোগ করে, ইসলামিক ইতিহাস বিকৃত করে অর্থাৎ লোকায়ত ভঙ্গিতে মুসলিমদের কাছে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত জারি বয়াতি আহাম্মদ আলী (ট্যাবলেট মুন্সি) বলেছেন- ‘যদি খালি ঘটনাগুলা মওলানারাও মসজিতে বলে কিন্তু সেটে খোনাতে মানুষগুলা শুনতে যায় না আমরা রস-কশ দিয়া সেই ঘটনাগুলায় বলি তাতে মানুষ একেবারে পাগল হয়া যায়,

আর একটাই পালায় বারেবারে শুনবার চায়'[২৬]। ফলত মৌলবীরা উক্ত অভিযোগ গুলি উল্লেখ করে, জারি গানকে শরীয়ত বিরোধ গান হিসেবে ঘোষণা করে, তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বয়াতিদের জীবনী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই গান প্রান্তিক এলাকায় চলাকালীন হঠাৎ গোঁড়া মৌলবীরা আক্রমণ করে গীত পরিবেশন করতে নিষেধ করে। তারা গান না থামালে শারীরিক ভাবে প্রহার করা হয়। সর্বোপরি গানকে অচল করে দেওয়ার জন্য গোঁড়া মৌলবিরা আদালতের কাছে দারস্ত হয় এবং গানের বিরুদ্ধে জনসমাজে নানা ভাবে প্রচার চালানো হয়েছিল। অন্যদিকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার করেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় লোকাচার পালন করা বা জারি শোনা থেকে বিরত থাকতে বলে। এরপরও তারা প্রতি বছরের ইসলামিক এস্তেমা বা জলসার আয়োজন এবং চিল্লা ব্যবস্থা করে *কোরান* এবং হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে সঙ্গীত শুনতে নিষেধ করেন-

> চোখের দৃষ্টি যেমন মানুষকে বিপরীত লিঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করে, তেমনি করে গানের সুর। মধুর কণ্ঠস্বর মানুষকে মোহাবিষ্ট করে, ফলে ভাল- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের পার্থক্যবোধ সে হারিয়ে ফেলে। এই কারণে ইসলাম গান- বাজনার কোনো স্থান নেই। বিশেষ করে সুন্দরী যুবতীর সুমিষ্ট কণ্ঠের গান পুরুষের জন্যে এবং অনুরূপ পুরুষ কণ্ঠের গান মেয়েদের জন্যে খুবেই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। বস্তুতঃ গান- বাজনা যে মানুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে, অনস্বীকার্য[২৭]।

এই হাদিসটি ছাড়াও ইসলাম ধর্মের মূল ধর্ম গ্রন্থ *কোরান* এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন,

> লোকদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিত করে আনে, যেন লোকদের সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র পথ হতে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। এই ধরনের লোকদের জন্য কঠিন ও অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। সুরা লুকমান রুকূ ১ ৬ নং ২১ পারা[২৮]

উল্লিখিত হাদিসটি ছাড়া *কোরানে* তেমনভাবে সরাসরি সংগীত বিষয়ে নিষেধের কথা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে *কোরান*-এর সুরা মায়েদা-য় ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আমি প্রত্যেক জাতিকে দান করেছি নিজস্ব ধর্ম ও জীবনাচার'[২৯] অর্থাৎ স্থানীয় সংস্কৃতি পালনের অনুমতি রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিশ্ব নবী হজরত মহাম্মদ' নিজেও সঙ্গীতকে ভালবাসতেন, তার প্রমাণ পাই, 'নবীর জীবিত অবস্থায় এক

কবি না'ত লিখে শোনান। সে না'ত শুনে মুগ্ধ হয়ে নবী সেই কবিকে আপন উত্তরীয় দান করেছিলেন'[৩০]। এরপর যদি আমরা ইসলামিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ রাখি তাহলে দেখব, 'শিল্প হিসেবে সংগীতের যাত্রা শুরু হয় উমাইয়াদের আমলে এবং তা পুরন্তা লাভ করে আব্বাসীয়দের হাতে। আব্বাসীয় রাজদরবারে সংগীতের শিল্পীদের প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করা হতো। খলিফাদের কাছ থেকে আন্তরিক পৃষ্ট-পোষকতা লাভের দরুন তাঁরা বাগদাদে সমবেত হতেন। কালক্রমে সংগীত পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব লাভ করে এবং রাজধানীতে অনেকগুলো সংগীতের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আবুল ফায়াজ ইস্পাহানি সংগীত বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ২১ টি অংশ ছিল এবং তাতে ১০০ টি পৃথক সুর ব্যাখ্যা করা হয়। ইমাম গাজালি তাঁর ইহিয়া উলম্ আল-দীন (ধর্মীয় বিজ্ঞান সমূহের পুনর্জীবন) গ্রন্থে বিধিগত ও বিধিবহির্ভূত সংগীতের মধ্যে পার্থক্য দেখান। তাঁর মতে বিধিগত সংগীত মস্তিস্ক ও স্নায়ুর পক্ষে খাদ্য স্বরূপ'[৩১]। এই ভাবে ইসলামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সু-সংগীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ধর্ম পালন করার জন্য সুর দিয়ে আজান, সুরে *কোরান* পাঠ ও মিলাত পাঠ করা হয়। ফলত বর্তমান সমাজে মৌলবীরা শাস্ত্রীয় পালনের নানা উপদেশ দিলেও তা কোনো ভাবে এই প্রান্তিক সমাজে মানুষের কাজে লাগে না এবং গোঁড়া মৌলবীদের এই গানকে লুপ্ত করার ভাবনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়। তার প্রমাণ মেলে, বয়াতিরা গানের মাধ্যমে সমাজে মুখোস পরে থাকা ব্যক্তিদের আসল চরিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে। যেমন-

ওরে ধরলি নামাজ পরলি নামাজ সারা জীবন ভর

নামাজ হইলনা তোর নামাজের নিলিনা খবর!

নামাজ পড়া তোমার ধর্ম, চুরি তোমার পেশা

সেই নামাজ হইল না তোর।

নামাজের কাতারে দারাইয়া মন থাকে তোর দুনিয়ার খেয়ালে

পাঞ্জাবি পায়জামা টুপি সবে তোর সাদা

ওরে মনে যদি থাকে তিল পরিমানে কাদা

মসজিদে আজান দিলে সবার আগে যায়

নামাজ শেষে আসিয়া সুদের টাকা খাও

নামাজ হইল না তোর নামাজের নিলিনা খবর[৩২]।

সমাজে বহু মুসলিম শুধুমাত্র মানুষ দেখানোর জন্য মসজিতে নামাজ পড়তে যায়। অথচ তারা সেই নামাজ সঠিক ভাবে হল কিনা সেবিষয়ে ধ্যান রাখে না এবং নামাজ শেষে তারা হারাম খাবার ভক্ষণ করে। এই গানটি যেমন সমাজের বাস্তব ছবি তুলে ধরেছে। এই কারণে প্রান্তিক মুসলিম সমাজের জারি গান সংস্কৃতির এক অনন্য সম্পদে পরিলক্ষিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, তারা যখন গানের মাধ্যমে বলেন-

নামাজ পরিও রোজা রাখিও রে

দিন থাকিতে কর রে আখেরতের কামাই

বেনামাজি মারা গেলে দোজক যে তার ঠিকানা'[৩৩]।

তখন মৌলবিদের ক্ষণিকের জন্য একটা সমঝোতার সূত্র গড়ে ওঠে। অন্যদিকে বয়াতিরা গানের মাঝে সৃষ্টির প্রথম মানব আদম-হাওয়ার সম্পর্কে একটি প্রচলিত লোক-গল্প বলে হিন্দু-মুসলিমদের সামাজিক বন্ধন মুক্ত করতে চেষ্টা করেন।

আদম-হাওয়া এই পৃথিবীতে আসার পূর্বে বেহেস্তে আল্লার নিষেধ সত্ত্বেও একটি ফল সত্যেও আদম-হাওয়া সেই ফলটি মুখে দেয়। এতে আল্লা নারাজ হয়ে যান। ফলে তাদের জান্নাতের আর জায়গা হয় না। অন্যদিকে তাদের দুই পুত্র এবং দুটি কন্যা সন্তান ছিল। বড় ছেলের সঙ্গে বড় মেয়ে এবং ছোট ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়। একদিন তারা বাগানে ভ্রমণ করতে গেলে শয়তান ছোট ভাইকে স্মরণ করে দেন যে, তোর বিবির থেকে তোর দাদার বিবি অনেক সুন্দর। একই সঙ্গে শয়তান পরামর্শ দেন তোর দাদা যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন তার মাথার উপর পাথরের বারি মারবি, তাহলে তুই তোর দাদার বিবিকে লাভ করবি। ছোট ভাই নিজে কোন বিবেচনা না করে শয়তানের কথা মতো কাজ করে। পরক্ষণে তার দাদা মাটি থেকে না উঠলে তিনি বিষণ্ণ হয়ে যান। সেই সময় গাছের দিকে তাকালে দেখে দুটি কাক প্রচণ্ড ঝগড়া করছে। একটি কাক অপর কাকটিকে মেরে ফেলে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে-ই তাকে মাটিতে গর্ত করে পুথে রাখে। এই দৃশ্য দেখার পর কাবিল তার দাদাকে একই ভাবে মাটিতে গর্ত করে পুথে রাখে। এরপর শয়তান আদম-হাওয়া মূর্তি গড়েছেন এবং কাবিলকে বলেন ওই দেখ তোর বাবা-মা তোর দাদার শোকে পাথর হয়ে গেছে তাই তাদের পূজা কর। শয়তানের কথা মতো কাবিল তার বাবা-মা কে পূজা করতে

শুরু করে। এই ভাবে একজন হলেন মুসলিম আর একজন হলেন হিন্দু। আল্লা, ভগবান, গড়- একজন-ই। সৃষ্টির মুখে আমরা এক ছিলাম। এই সব-ই শয়তানের চক্রান্ত[৩৪]।

বলাই বাহুল্য, এই ধরনের প্রাচীন মিথ বা উপকথা লোকসমাজে প্রচার করলেও আজকের জনসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাছাড়াও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সামাজিক হিন্দু–মুসলিম দুই ধর্মের মানুষকে 'এক বৃন্তে দুইটি কুসুমে' অর্থাৎ সামাজিক মেলবন্ধন ঘটাতে পারে তার নানা চিহ্ন এই অঞ্চলের মূল জারি গানের পালাগুলিতে তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে গানে ব্যবহৃত কয়েকটি কাহিনি বিশ্লেষণ করা যাক-

শিবায়ন কাব্য এ-শিব'কে যেমন দারিদ্র কৃষক হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে অনুরূপ ভাবে তেমনি 'জাবেরের দাওয়াত' পালায় মহানবী হজরত মহাম্মদকে ফকির বেশ ও সাতদিনের উপবাসরত এক সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখা যায়।

এই অঞ্চলের 'বিষহরী' পালায় এক সময় চাঁদ সওদাগর ধন, সম্পদ, পুত্র ইত্যাদি হারিয়েছেন। 'আইব নবী' পালায় চাঁদের মতোই তার জীবনে নানা অভিশাপ নেমে এসেছে। অন্যদিকে তার পত্নীকে যথার্থ ভাবে *রামায়ন*-এর সীতা'র মতো সতী সাবেত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

সর্বোপরি কারবালা'র পালায় বর্ণিত হোসেন চরিত্রটি বীর শ্রেষ্ট মহাপুরুষের পরিচায়ক। ইসলামের দীন' প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজেকে যেভাবে কোরবানি করেছেন তা আজও প্রান্তিক জনসমাজ মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে এই ধরনের গান শোনার মাধ্যমে সেই শোক প্রকাশ করে। তাঁর মৃত্যু *রামায়ন ,মহাভারত* গ্রন্থের এক একটি চরিত্রের বীর এর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর কারবালার যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে'র যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে তাঁর বাবা হজরত আলিকে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী মানব হিসেবে দেখনো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি বিশ্বকর্মা বা ভীম'এর সমতুল্য হিসেবে দেখনো হয়েছে এবং জগৎ মাতা ফাতেমাকে প্রান্তিক অঞ্চলের পুত্র হারা বা কোনো দুঃখিনী মা হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। অন্যদিকে কাসেমের পত্নী ছকিনা'র দুঃখ স্বামী হারা বেহুলা কিংবা স্থানীয় কোনো বালবিধবা নারীর দুঃখের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে । আবু মুছা জঙ্গি পালায় দেখা যায়, ভণ্ড ফকির ভিক্ষা করতে

এসে আবু মুছা স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখে পাগল হয়ে তাকে জোর করে নারীর সম্মান হরণ করতে চেষ্টা করে। এই ভণ্ড ফকিরের মাধ্যমে *রামায়ন*- এর রাবনের দ্বারা সীতাকে হরণ চিত্র পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে। মনছুর হাল্লাদ পালায় দেখা যায়, সবুরা ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করলে কুমারি অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং তার বাচ্চা লোকালয় এর বদলে বন-জঙ্গলে মানুষ হয়। এই চিত্র আমাদের *মহাভারতে*-র কুন্তী এবং কর্ণের কথা মনে করে দেয়। ফলত এই কাহিনিগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের মানুষ বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত হয় তেমনি অন্যদিকে হিন্দু সমাজের মানুষ পরোক্ষ ভাবে তাদের ধর্মের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা খুঁজে পায়। অর্থাৎ একই কাহিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন স্থান গড়ে উঠেছে। এরপরও আমরা লক্ষ করেছি একটি গানে-

‘আমরা হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে নিয়ে গান করি

আমার নিজে খোদা আসিক হইয়া নামের প্রতি নাম রাখলেন জাইয়া

আরসের ময়দানে সেই নিরসান উড়ছে গিয়া।

ঈমান খেলা খেলছে রাসুল লিলা করে ঘনশ্যামে

ওরে মদিনাতে মহাম্মদ মথুরাতে ঘনশ্যামে

মোসলমানে পরে নামাজ গিয়া মসজিতে

আর সোনাতনে করে পূজা মন্দিরে গিয়া’[৩৫]

এই গানটির মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ করি, হিন্দু-মুসলিম দুই সমাজের মানুষের মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত উত্তরবঙ্গের মুসলিম লেখক বজলে রহমানের মত, ‘জারিগানকে মুসলিম সমাজের গান বলা হলেও মূলত এই গান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উপভোগ করে’[৩৬]। আরও উত্তরের প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত চাকী বলেছেন, ‘জারি গান হল শোকের গান। কোচবিহারে এই গান বহু দিন ধরে প্রচলিত আছে। বয়াতিরা ইসলামিক ইতিহাসের নানা কথা গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন’[৩৭]। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি লেখক অভিজিৎ দাশ বলেছেন, ‘বর্তমান সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য জারি গান একটি অন্যতম হাতিয়ার। মানুষের মনের মধ্যে এই গানের জন্য একটা চিরস্থায়ী আসন আছে’[৩৮]। এছাড়া এই অঞ্চলের

বর্তমানে একজন বিশিষ্ট পীরসাহেব খন্দকার মমিরুল হক বলেছেন, 'জারি গান কোচবিহারের মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির অঙ্গ বলা যায়'[৩৯]। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, যখন একজন পীর সাহেব এই মতামত ব্যক্ত করেন তখন বলা যায় দীর্ঘদিনের জাত-পাতের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র কোচবিহারের প্রান্তিক সমাজের লোকগান হয়ে উঠেছে। এছাড়াও জারি গানে ব্যবহৃত তত্ত্বমূলক ও সামাজিক গানগুলি প্রান্তিক লোকসমাজকে সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজ গঠনের দাবী রাখে। ফলত জারি গানের মাধ্যমে একদিকে যেমন হিন্দু–মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় করে তুলছে, তেমনি স্বচ্ছ মানবতাবোধ, প্রান্তিক জীবনের প্রাণরস বোধের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

১) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদিত), *উত্তর প্রসঙ্গ,* জেলা সংখ্যা ১ম খণ্ড, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০০৯, পৃ ০১

২) রায়, কৃষ্ণেন্দু, *উত্তরবঙ্গের সীমান্ত,* দিসী বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ ৭

৩) তদেব পৃ ১৭

৪) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদিত), *উত্তর প্রসঙ্গ,* জেলা সংখ্যা ১ম খণ্ড, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০১১, পৃ ২০

৫) রায়, কৃষ্ণেন্দু, *উত্তরবঙ্গের সীমান্ত,* দিসী বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ ১২

৬) তদেব পৃ ৯২

৭) তদেব পৃ ৭

৮) তদেব পৃ ২০

৯) তদেব পৃ ১৪১

১০) চাকী, দেবব্রত (সম্পাদিত), *উত্তর প্রসঙ্গ,* জেলা সংখ্যা ১ম খণ্ড, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, প্রকাশকাল ২০১১, পৃ ৫৬

১১) হোসেন, আমজাত, *কামরূপ থেকে কোচবিহার,* সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, ২০১৪, পৃ ২৩৭

১২) তদেব পৃ ২৩৬

১৩) চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কল ০৯, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১২, পৃ ৫০৭

১৪) তদেব পৃ ৪১৪

১৫) তদেব পৃ ৪১৬

১৬) সেন, সৌমেন, *লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব পদ্ধতি*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ ৭২

১৭) তদেব, পৃ ৭৫

১৮) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, তারিখ-২১ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২. ২২ মিনিট

১৯) সাক্ষাৎকার, জনাব আলী, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ-১১ নভেম্বর২০১৮ সময়- বিকাল ০৩. ২৭ মিনিট

২০) সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ-১৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ২০ মিনিট

২১) সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ-১৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ২০ মিনিট

২২) সেন, সৌমেন, *লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব পদ্ধতি,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ ৫৪

২৩) গুপ্ত, পল্লব সেন, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯ তৃতীয় সংস্করন ২০১০, পৃ ২১৮

২৪) চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা ০৯, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১২, পৃ ২৯৯

২৫) সাক্ষাৎকার, জনাব আলী, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ-১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৩. ২৭ মিনিট

২৬) তদেব

২৭) রহীম(রহ), মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল, *নারী,* আফতাব আর্ট প্রেস, ঢাকা, প্রথম সংস্করন জুলাই ১৯৯০, পৃ ১১৯

২৮) মওদূদী (রহঃ), সাইয়েদ আব্দুল আল, *পবিত্র কোরান,* বাংলা ইসলামিক প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা, পৃ ৩৪০

২৯) মল্লিক, হাসির, মুসলমান *আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব* বটতলা, কলকাতা ৭০, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ১১

৩০) তদেব, পৃ ৮৫

৩১) ইসলাম, ড. আমিনুল, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃ ৯০

৩২) সাক্ষাৎকার, মমিদুল মিয়া, কোচবিহার, সিতাই(বত্তর–চামতা), তারিখ-২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪.২০ মিনিট

৩৩) সাক্ষাৎকার, জনাব আলী, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ-১৪ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৩.২৭ মিনিট

৩৪) সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, নয়ার হাট, তারিখ-১৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ২০ মিনিট

৩৫) সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, তারিখ-২১ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০২.২২ মিনিট

৩৬) সাক্ষাৎকার, বজলে রহমান, কোচবিহারের প্রখ্যাত মুসলিম সমাজের লেখক, স্থান- কোচবিহার, তারিখ ২৭ নভেম্বর ২০১৮ সময় বিকাল ০৬.১২ মিনিট

৩৭) সাক্ষাৎকার, দেবব্রত চাকী, সম্পাদক উত্তর প্রসঙ্গ, স্থান- কোচবিহার, তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৮ সময় বিকাল ০৪. ১২ মিনিট

৩৮) সাক্ষাৎকার, অভিজিৎ দাশ, কোচবিহারের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি বিদ, তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৮ সময় সন্ধ্যা ০৭. ১৪ মিনিট

৩৯) সাক্ষাৎকার, পীর সাহেব, খন্দকার মমিরুল হক, স্থান- কোচবিহার, কারিসাল, তারিখ ২৯ নভেম্বর ২০১৮, সময় দুপুর ১২.৩০ মি.

উপসংহার

বর্তমানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা নগরায়ণের প্রভাব প্রান্তিক সমাজের নানা অংশে পড়লেও এই সমাজে জারি গানের জনপ্রিয়তা কোনো অংশেই কমে যায়নি। বরং তাঁরা কারবালার মর্মান্তিক বা শোকায়ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারি গান শুনে ক্ষান্ত থাকলেন না। সেই সঙ্গে ইসলামিক নানা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সন্ধান করে জারির সুরে গীত শুনতেও দেখা গেল। সেই কাহিনিগুলিতে বয়াতিরা প্রান্তিক সমাজের মানুষের প্রতিনিহিত ঘটে চলা সুখ, দুঃখ, কষ্ট এবং বীরত্বের ভাবনা ঢেলে দিয়ে দীর্ঘ পালা আকারে জারি গান অঙ্কিত করেছেন। আবার প্রান্তিক মুসলিম সমাজের পটভূমিকায় এই ধরনের কাহিনির চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে এক-একটি আদর্শবাদী। যা তাদের জীবনে চলার পথে নানা ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাজবংশী সমাজের মানুষ এই কাহিনিগুলির মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মের বহু বীর নারী-পুরুষের প্রতিরূপ খুঁজে পান। ফলত, এই গান তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে জনপ্রিয়।

এছাড়াও এই ধরনের কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে বয়াতিরা সামাজিক, দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, মনোরঞ্জনমূলক প্রভৃতি লোকগানের মিশ্রণে জারি গানের আদল তৈরি করেছে। ফলত একদিকে কাহিনিগুলি শুনতে যেমন শ্রুতি মধুর হয়ে উঠেছে, তেমনি এই ঘটনাগুলিতে এমনভাবে সুখ-দুঃখ দারিদ্রতা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি অঙ্কিত হয়েছে, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রান্তিক সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বলাই বাহুল্য যে, গানের পালাগুলির বেশিরভাগ অংশ করুন সুরে বর্ণিত হয়, যেখানে কোচবিহারের জল-মাটি-বাতাসের গন্ধ মিশ্রিত আছে। তাছাড়াও গানগুলি ক্রমান্বয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রান্তিক মুসলিম সমাজের লোকগানের গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র কোচবিহারের প্রান্তিক সমাজের লোকগান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অন্যদিকে ইসলামি ঐতিহাসিক কাহিনিগুলি বয়াতিরা জারি গানের সুরে বর্ণিত করলেও স্থানীয় গোঁড়া মুসলিমরা শরীয়তের বেদাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফলে বিভিন্ন সময়ে এই গানকে কেন্দ্র করে সমাজে চলেছে দ্বন্দ্ব-সমঝোতা।

ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও তার রীতিনীতি এই অঞ্চলের প্রান্তিক সমাজকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি এই গানের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব এড়িয়ে যায়নি। বিশেষত পূর্ব বাংলার সঙ্গে এই গানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে গানের আদল যেমন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রান্তিক সমাজের বাস্তবতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে গানে। এই সব মিশ্রণের ফলে জারি গানের একটি ভিন্ন আদল গড়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য যে, কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের প্রচলিত জারি গান, মহরমের শোকগান সম্পর্কে দীর্ঘদিনের একটা বদ্ধ ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গুরু শিষ্যের পরম্পরার মৌখিক ধারার এই গানগুলিকে নানা তথ্যের আঙ্গিকে ঢেলে, যেমন নানা লোকাচার পাওয়া গেছে, যা লোকগানের জগতে উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচিতি বহন করে, তেমনি কোচবিহারের প্রান্তিক মুসলিম সমাজের একটি অজানা ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। যা দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের সাধারণ মানুষের কাছে অজানা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা. কলকাতা: *কোচবিহারের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫

আহমেদ, ওয়াকিল. *জারি গান,* ঢাকা: বইপত্র ৩৮/২ক বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৯

ইসলাম, ড. আমিনুল. *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯১

উদ্দিন, আব্বাস. *আমার শিল্পী জীবনের কথা,* কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০১

উদ্‌দীন, জসীম. *জারীগান,* ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, চতুর্থ প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ২০১৩

উদ্‌দীন, জসীম. *মুর্শিদা গান,* ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, আগস্ট, ২০১২

চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার. *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারী, ২০০৪

চৌধুরী, শীতল. *লোকসঙ্গীত চর্চা,* কলকাতা: রূপা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

চৌধারী, ড. দুলাল চৌধারী. *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

দাশ, অভিজিৎ. *তিস্তা উৎস থেকে মোহনা,* জলপাইগুড়ি: এখন ডুয়ার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯

দাস, সুকুমার. *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস,* কলকাতা: কুমার সাহিত্য প্রকাশক, ১৯৮২

দে, ড. দিলীপ কুমার. *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি,* কলকাতা: অনিমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১৫

দে, নির্মলেন্দু ভৌমিক. *প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত*, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১১

ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ. *বাংলার লোকসাহিত্য,* কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস ১/১, কলেজ স্কোয়ার, প্রকাশ ১৯৫৪

মওদূদী (রহঃ), সাইয়েদ আব্দুল আল. *পবিত্র কোরান,* কলকাতা: বাংলা ইসলামিক প্রকাশনী ট্রাষ্ট, ২০১২

মল্লিক, হাসির. কলকাতা: *মুসলমান আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব* , বটতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৫

রায়, কৃষ্ণেন্দু. *উত্তরবঙ্গের সীমান্ত,* কলকাতা: দিসী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৩

রহমান, বজলে. *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ,* কোচবিহার: শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশসন, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৮

রশীদ, রত্না. *জারি-জঙ-মোর্শিয়া.* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮

রহীম(রহ), মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল. *নারী,* ঢাকা: আফতাব আর্ট প্রেস, প্রথম সংস্করন জুলাই ১৯৯০

শর্মা, উমেশ. *মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া,* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ ২০০৫

সেন, গুপ্ত পল্লব. *লোক সংস্কৃতি সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করন, জানুয়ারী, ২০১০

সিদ্দিকী, মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ. *মুসলিম উৎসব ঐতিহ্য,* ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশক, এপ্রিল, ২০০২

সেন, সৌমেন. *লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব-পদ্ধতি.* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল. *বঙ্গে সুফী –প্রভাব,* ঢাকা: বাংলা বাজার র‍্যামন পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

হোসেন, আমজাত. *কামরূপ থেকে কোচবিহার,* কলকাতা: সুরিত পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করন, নভেম্বর ২০১৪

পত্র-পত্রিকা

উত্তর প্রসঙ্গ, উত্তরবঙ্গের নদীকথা ১ম খণ্ড, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০১৮

উত্তর প্রসঙ্গ, হুজুর সাহেব সংখ্যা, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০০৯

উত্তর প্রসঙ্গ, উত্তরবঙ্গের নদীকথা ১ম খণ্ড, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন

উত্তর প্রসঙ্গ, জেলা সংখ্যা ১ম খণ্ড, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০০৯

উত্তর প্রসঙ্গ, জেলা সংখ্যা ১ম খণ্ড, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, উত্তর প্রসঙ্গ পাবলিকেশসন, ২০১১

সৃজনী ধারা, উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি, পার্থ প্রতিম মল্লিক সম্পাদিত, জলপাইগুড়ি, গোমস্তাপাড়া, বিশেষ সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৩

প্রাথমিক তথ্য:

জারি গানের বয়াতিদের সাক্ষাৎকার আহাম্মদ আলী (ট্যাবলেট মুন্সি), আমিনুল ইসলাম, আয়নাল মিয়া, মমিনুল মিয়া, সফিকুল মিয়া, সিদ্দিক মিয়া, কপির হোসেন প্রমুখ।

স্থানীয় চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষাৎকার, বিশিষ্ট মুসলিম লেখক বজলে রহমান, উত্তর প্রসঙ্গের সম্পাদক দেবব্রত চাকী, প্রখ্যাত লোক সংস্কৃতি লেখক অভিজিৎ দাশ, প্রখ্যাত পীর সাহেব খন্দকার মমিরুল হক প্রমুখ

ইন্টারনেট

https://www.youtube.com/watch?v=eDAm1FD_oLE&list=PLFoHP4oe8mZI0LbmugFY5MFPd_GUdMH

https://www.google.com/search?q=Koch+Bihar+religion-wise+data+2011&oq=Koch+Bihar+religion-wise+data+2011&aqs=chrome..69i57.4043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?ei=LKrLXIzGM4DDz7sPksm68Ao&q=block+wise+map+of+cooch+behar+district&oq=koch+bihar+map&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..97805...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.5t2KsArLmGg

চিত্র সংগ্রহ

চিত্র সংগ্রাহক - গবেষক

জারি গান সংগ্রাহক – গবেষক

পরিশিষ্ট

কারবালার পালা

এজিদ চক্রন্ত যায় যে করিয়া, হাসানকে মারিবার লাগিয়া

হাসানের বিবি জয়নব ছিল যেমনে যুবতি তেমনি সুন্দরী

তাই তো সেদিন এজিদ জয়নবের রূপে গেল পাগল হইয়া

দেখাইল টাকা পাইসা আরও গহনার লোভ খানা

তাই দেখিয়া জয়নব স্বামীকে মারিবার লাগিয়া গেল রাজি হয়া

প্রিয় আদরের ভাই হোসেন ছিল সেদিন ছিল না বাড়িতে

আরও কাও ছিল না যে ছিল না বাড়িতে, সবাই যে গেইছে দাওয়াতের লাগিয়া

এই সুজোক খানা জয়নব লাগায়া দেয় কাজে

আল্লার নিলা খেলা কে বুঝিতে পারে স্বামীকে দুধের সাথে দিল বিষ মিশাইয়া

মনের সুখে হাসান যখন সেই দুধ খাইল, শয়তানের খেলা তখন শুরু হয়া গেল

সেদিন হাসান বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিল

জয়নব তখন খিল খিল করিয়া হাসিতে আরম্ব করিল

আজরাইল জান কাবেস আসিয়া বলিল, কি করবু হাসান

বেইমান বিবির চক্রান্ত আগে বুঝিবার পাইস নাই

এলা যে তোর জান কবস করিতে হইবে মোক

আজরাইল হাসানের জানের প্রানের পাখি নিয়া যায় উড়িয়া

এদিক মধ্যে হোসেন যখন বাড়িতে চলিয়া আসিল

তখন দাদার মরা দেহ দেখিতে পায়া মাটিত পড়িয়া কান্দিতে শুরু করিল

হোসেন কান্দিয়া কান্দিয়া বলিল, আজি কায় মোক ভাই করিয়া ডাকাইবে রে

আজি মাও নাই বাবাও নাও তুই দাদা ছিলি তাও চলিয়া গেলি রে

এদিক মধ্যে এজিদ যায় দ্বিতীয় চক্রান্ত করি

কেমন করি আহেলি পরিবারের বাতি হোসেনকে যায় মারা

এজিদ ছলনা করিয়া একের পর এক করে ১০৭খানা চিঠি দিল

মক্কায় পাঠাইয়া, ইসলাম গ্রহণ করিবে তার লাগিয়া

হোসেন সেইনা চক্রান্ত না বুঝিয়া কুফায় যেতে চাইলো

মোসলেম তখন বাঁধা দিয়া কুয়ার পরিস্থিতি দেখার লাগিয়া নিজেই চলিয়া গেল

হোসেন যখন মোসলেমের চিঠি পাইল তখন কুফায় যাওয়ার জন্য আয়োজন করিল

এদিক মধ্যে মক্কাবাসী হোসেনকে কিছুতে যেতে দিচ্ছে না

মক্কাবাসী জারে জারে কান্দিয়া কান্দিয়া তোর বাপ গেছে দাদা গেছে

তুই যদি আমাদের ছেড়ে যাস ভাই তা হইলে কাক নিয়া হামরা বাচমো রে ভাই

এই ভাবরে মক্কাবাসী কিছুতে যেতে হোসেনকে দিচ্ছে না

যতবারে যাওয়ার আয়োজন করে মহাব্বতের লাগিয়া ততবারে তারা দেয় বাঁধা গিয়া

শেষে কোনো মতে মক্কাবাসীদের হোসেন দেয় বুঝাইয়া,

দেখ বাপ ভাই নানা সবাই যখন দিনের রাস্তায় গেছে

ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া যদি মরন হয় তাহলে ‘ইনসা আল্লা’

এবার মক্কাবাসীর কাজ থাকিয়া বিদায় নিয়া চলিল কুফার শহরের লাগিয়া

এজিদ-আব্দুলার চক্রান্তে হোসেন যায় পথ ভুলিয়া

কুফায় না গিয়া কারবালার পথে যায় চলিয়া

এদিক মধ্যে একে একে শয়তানের দল চতুর দিকে হোসেন ফেলে ঘিরিয়া

এই ভাবতে এক দিন দুই দিন তিন দিন যায় চলিয়া

ছোট ছোট বাচ্চারা প্যাটের ভোগে কান্দে মাও মাও বুলিয়া

ওরে যত সব খাবার ছিল সবে যে গেছে ফুরিয়া

রান্নার লাগিয়া শুকনো গাছ কাটতে গেলে রক্ত পরে ঝড়িয়া

হোসেন বুঝতে পারে এই তো আসিছে মরণ মোর কাছে চলিয়া

আজি বুঝি নানা জানের বলা কথা যায় সত্যি হয়া

একদিন দিনের নবী দেখেছিল স্বপ্ন মোবায়ার পুত্রের দ্বারা হবে হোসেনের মরণ

সেই কথা মোবায়াকে জানালে কোনদিন নারীর সঙ্গ না করার ওরাদা করে

আল্লার নিলা কে বুঝিতে পারে, রোগের ঠ্যালায় মোবায়া বুরা বয়সে করিল নিকা

বুরা বয়সে মোবায়া সন্তানের বাবা হইল, পুত্রের নামখানা এজিদ রাখিল

সেইনা এজিদ আইলি পরিবারের শত্রামি করছে আজিকা

সে কথা যাক থাক হোসেনের দলের সবাই ভোগের জ্বালায় আতলা আতলি শুরু করিল

বাচ্চার কান্দন সয্য করিতে না পারিয়া মা যায় হোসেনের কাছে ছুটিয়া

হোসেন বিবিকে কয় কেমনে আনিয়া খায়াবো পানি, ফোরাত নদী যে শত্রুরা রাখিছে ঘিরিয়া

সন্তানের জ্বালা সয্য না করতে পারিয়া, শত্রুর কাছে হোসেন যায় পানি চাইয়া

শত্রুরা হোসেনকে দেখা মাত্র শত তির মারে এক এক করিয়া

দুধের সন্তান অসগর সেদিন যায় মারা

মৃত সন্তানকে হোসেন বিবির কোলায় দেয় তুলিয়া

তোমার সন্তান আজ জনমের মতো খাইছে পানি গিয়া

মাও মোর কান্দে কান্দে জারে জারে সন্তানের লাগিয়া

হোসেন শত্রুর কাছে মাথা নত না করিয়া যুদ্ধ যায় করি

সেই না কাসেম গেল শহিদ হইয়া

কাসেমের লাগিয়া কান্দে সকিনা বিবি জারে জারে

আগা রাইতে মোর বিয়া হইল পাছা রাইতে হনু বিধুয়া

এই ভাবে হোসেনের দলে নারী- শিশু বাদে সবায় যায় মারা

হোসেন একাই যায় হাজার শত্রুর সাথে যুদ্ধ করিয়া

সেদিন কারবালার মরুভুমি রক্তে বন্যা যায় বহিয়া

অন্যদিকে যখন নামাজের ওয়াক্ত হয় হোসেনের তখন যায় মনে পরে

উজুর লাগিয়া ফোরাদ নদীর পানিরে দিল হাত দিলে শুধুই রক্তই দেখিতে পায়

নামাজে যখন দাঁড়াইল শিমর আসিয়া হাজির হইল

পিছন দিকে শিমর সোরা চালাতে গেলে হোসেন বলিল

ওরে শিমর কেন পিছন দিকে সোরা চালাবি

সামনে আসিয়া সোরা চালা রে শত্রুর বংশধর

সেদিন শিমর যখন হোসেনের গলায় সোরা চালাইল

তখন আকাশ বাতাস নদী নালা খাল বিল হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

কুফাবাসি কান্দে জারে জারে হায় হায় করিয়া, আর দেখা হবে দেখা ভাই হোসেন রে

শত্রুরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হোসেনের কাঁটা মাথা নিয়া ঢাক ঢোল দিয়া আনন্দ করছে যাইরা

আরও নারী, শিশুদের বন্দী করিয়া দামাস্কায় দিল পাঠাইয়া

অন্যদিকে নয় খরিদার ব্রক্ষণ হোসেনের কাঁটা মাথা দেখিয়া গেল পাগল হইল

সেই না মাথার বদলে ব্রক্ষণ একে একে চারপুত্রকে মারিয়া এজিদকে দেখাইল

তবু না এজিদ বিশ্বাস না করিল, তাই সে হোসেনের মাথাই এনে দিল

এদিক মধ্যে জয়নাল আবেদিন বড় হইতেছে বন্দী কারাগারে

বন্দী দশা সয্য করতে না পায়া দিনের পর দিন যায় সে কান্না করিয়া,

তার কান্না দেখিয়া এক চকিদারের যায় মায়া পরি

তাই সেদিন চকিদার যায় সুন্দর করিয়া জিজ্ঞাস করিয়া

জয়নাল আবেদিন যায় পরিচয় দিয়া ,মুই যে মদিনার একমাত্র বাতি

ছোট জয়নাল আবেদিন কান্দিয়া কান্দিয়া চাচা হানিফার কথাও জানায়

সেদিন সে চকিদারকে দিল একখানা চিঠি লেখিয়া

সেই না চিঠির ক্ষমতায় চকিদারকে বাঘে না খাইল, নদীতে না পড়িল

তুফালের বেগে নিমিষে হুনুফার শহরে হানিফার কাছে যায় চলিয়া গেল

হানিফা পত্রখানা পাঠ করিয়া, ভাইস্তার লাগিয়া দামাস্কায় ছুটিয়া আসিল

শত শত শত্রুকে দমন করিয়া যখন জয়নাল আবেদিনের কাছে গেল

জয়নাল আবেদিন চাচাকে চিনতে না পারিয়া লোহা দিয়া আঘাত করিল

হানিফা তাকে যখন মারিতে গেল, হঠাৎ করিয়া তার ভাইস্তার কথা মনে হল

তাই তো জয়নাল আবেদিন জিজ্ঞাস যায় করিয়া

বাবা তোমার কিবা পরিচয়, কি করিয়া তোমার এই দশা

জয়নাল আবেদিন যখন পরিচয় দিল হানিফা তখন বুকে জরাইয়া ধরিল

এরপরতে হানিফা আব্দুল- আজিদকে করিল ধাওয়া, তুর পাহাড়তে বন্দী হইল তারা

হানিফা জয়নাল আবেদিনকে সঙ্গে করিয়া দেশে আসিল ফিরিয়া।

(সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ-১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪.৩০ মিনিট)

মোসলেম পালা

শুরু করছি দুঃখের জারি মোসলেমের দুঃখের জীবনী নিয়া

কেউ করিবেন না গণ্ড গোল আজিকা, শুনিবেন সবাই মন দিয়া

হোসেন যখন কুফায় যাওয়ার আয়োজন করিল

মোসলেম আসিয়া তখন তাকে বাঁধা দিল,

তোমার আগত মুই যায়া কুফা জায়গাখান দেখি আইসং

হোসেন এই কথায় সুন্দর ভাবে জায় রাজি হইয়া

মোসলেমের পাছত চলিল দুই মাও মরা সন্তান ইব্রাহিম ও মহাম্মদ

উঠের পিঠে চরিয়া তিন বাপ বেটায় চলিল কুফার শহরের লাগিয়া

সেই সময় ইব্রাহিমের বয়স নয়, মহাম্মদের বয়স ছিল এগারো

বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়া যেতে যেতে মোসলেমের মনে ভয় জাগিয়া গেল

তাই তো সেদিন সোনার কাজির বাড়িতে রাখিয়া গেল

সঙ্গে বলিল ফিরে আসিলে হইবে দেখা,

না হইলে তোমরা চাচাকে কুফার লাগিয়া আসিতে বারন দিবে করিয়া

এই বলিয়া কান্দি কান্দি মোসলেম যায় কুফায় চলিয়া

ইব্রাহিম ও মহাম্মদ কান্দে আব্বাজানের লাগিয়া

আব্বাজন ছাড়িয়া কোথায় যাচ্ছেন না জানি চলিয়া

এদিক মধ্যে যখন মোসলেম কুফার শহরে গেল পৌছিয়া

তখন আব্দুলা জেহাদ মোসলেমকে দেখিয়া যায় ছলনা করিয়া

মোসলেম যাতে টের না পায়,

তার লাগিয়া সবায় যায় ইসলামের পোশাক পড়িয়া

মোসলেম ভাবিয়াছিল কুফার লোক আজি বুঝি

মোর হাত ধরিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে জাইয়া

হয় না হয়, এক এক করিয়া বহু কুফাবাসী ইসলাম ধর্ম করিল

এজিত তাই না দেখিল খেপিয়া গেইল

সেই রাতে তাকে মারার ব্যবস্থা করিল

মোসলেমকে মারার লাগিয়া আব্দুলা মারোয়ারকে অডার যায় দিয়া

তার আগত পলছি করিয়া আব্দুলা হোসেনের নামে একখানা চিঠি নেয় লেখিয়া

মোসলেম সাদা মনে বলে, ভাই হোসেনকে আইলি পরিবারের ৭২ জন নিয়া

তারাতারি কুফায় আইস চলিয়া, ইসলাম ধর্ম প্রচারের লাগিয়া

চিঠি যখন লিখে নিল শয়তান মারোয়ার আসিয়া হাজির হইল

মসজিত ঘরে নামাজ অবস্থায় তার গলায় কোপ চালাইয়া দিল

এদিক মধ্যে আব্দুলা জেহাদ, ইব্রাহিম ও মহাম্মদ খবর পাইয়া গেল

কুফার নগরে ইব্রাহিম ও মহাম্মদ খবর দিল ঘোষণা করিয়া,

যে বা তাদের ধরিতে পারিবে, লাক্ষ টাকা দিব তারে

এই ভাবতে যখন প্রচার হইয়া যায়

মরণের ভয়ে কাজি বাড়ি থাকিয়া তাঁদের দিল বিদায় করাইয়া,

জোর করিয়া ইব্রাহিম ও মহাম্মদকে মদিনার দিকে পথ দেখায় দেয়

এরপরতে দুই ভাই মিলে দিনে রাইতে কান্দিয়া কান্দিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেরায়

হারেজের স্ত্রী তুয়া বিবি পানি আনিতে গিয়া তাদের দেখিতে পায়

বাড়িতে আনিয়া তাদের সুন্দর করিয়া খানা দেয় খাইয়া

ইব্রাহিম ও মহাম্মদ তুয়া বিবিকে মাও বুলিয়া ডাকায় ।

তুয়া বিবি তখন দুই ভাইকে কোলায় তুলিয়া ন্যায়

তাই তো সেদিন তুয়া বিবি সকলের আড়ালে তাদের লুকিয়া রাখিল

হারেজ পাপি বাড়িতে আসিয়া যখন বাচ্চা দুটিকে দেখিল

টাকার লোভে তাদের আব্দুলার হাতে তুলে দিতে চাইল

বিবি অনুরোধ, নিজের সন্তানের অনুরোধ কিছুই না মানিল হারেজ পাপি সেদিন

যখন তারা বাঁধা দিতে আসিল, হারেজ তখন তাদের মারিয়া ফেলিল

এরপরেতে হারেজ, ইব্রাহিম ও মহাম্মদকে বস্তায় ঢুকিয়া

আব্দুল্লা জেহাদের বাড়ির দিকে যায় রহনা দিয়া

পথে যখন তারা কান্দা কাটি করিল হারেজ পাপি খেপিয়া গেইল

বস্তার মুখ খুলিয়া দুই ভাইকে জবাইল করিল

মাথা দুইটা নিয়া যখন হারেজ আব্দুল্লা জেহাদের বাড়ি গেল

আব্দুল্লা জেহাদ মরা মাথার রূপ দেখিয়া পাগল হইল

বলিল এই কাজ তুমি কেমনে করিলা হারেজ পাপি

যাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিব আজি, তাঁদের যে আজ ফেলিছিচ মারি

তাই তো সেদিন আব্দুল্লা জেহাদ, হারেজের মৃত্যু দণ্ড দিল গিয়া।

অন্যদিকে ইব্রাহিম ও মহাম্মদ এর ধর দুইটা জড়িয়ে থাকিল

কত নদ-নদীতে ভাসিয়া গেল, তবু না ধর দুইটা আলাদা হইল

সেদিন ভাই ভাইয়ের মহাব্বতের লাগিয়া কেউ কাউকে না ছারিল।

(সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ-১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৩.২৭ মিনিট)

হজরত বেল্লাল

ওরে হজরত বেল্লাল বাল্যকালে তাঁর নাম আব্দুল রহিম নাম ছিল

হঠাৎ বাবা ওই না মারা গেল, মা জননী ওই না সন্তান কে লইয়া

কিবা উপায় করে, এত গরীব ছিল তাঁর জায়গা জমি ছিল না রে

ওরে কাটরিয়া বলে পরিচয় ছিল বেল্লালের বাবের তাই

জংলে কাট কাটতে গিয়া মারা গেছে ভাই

ওরে মা দুঃখিনী সন্তানকে লইয়া ঘুরিয়া বেরায় রে

বেল্লালকে তার জননী দেয় যে ইহুদীর ঘরে বিক্রি করিয়া

ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া যায় তার জনম চলিয়া

একদিন ঘাস কাটতে গিয়া দারুন কান্না কাটি করে

আল্লাতালা আরস থাকি সেই কান্না শুনতে পায়

এদিক মধ্যে যখন সে ঘুমিয়ে ছিল

আল্লা তাকে গাইবি আওয়াজে দেয়

ওরে হঠাৎ করি যায় তার ঘুম ভাঙ্গি

আল্লার নিলা খেলা কে বুঝিতে পারে

আল্লা তাকে একখানা মন্ত্র দিল ‘লা ইলাহা ইল আল্লা হু’

সেইনা মন্ত্রখানা পাঠ করিয়া ঘাস কাটিতে যায়

ঘাসের বস্তা নিয়া যখন ইহুদীর বাড়ি যায়

‘লা ইলাহা ইল আল্লা হু’ তার মুখে শুনিয়া ইহুদি খেপিল ভাই

অনেক ভয় দেখাইয়া ইহুদি সেই মন্ত্রখানা ভুলিতে বলিল

যখন সে কিছুতে সেই মন্ত্রখানা না ভুলিল

চাবুকের আঘাত দিতে তাকে শুরু করিল

এরপরেও সে না ভুলিলে মারিয়া বালুর চরে ফেলিয়া দিল

এদিক মধ্যে দিনের নবী গাইবি আওয়াজ পাইয়া গেল

তাই তো বেল্লালকে বাঁচানোর লাগিয়া উমরকে পাঠাইয়া দিল

উমর আসিয়া তাকে বাঁচাইয়া নিয়া নবীর হাতে দেয় তুলিয়া

দিনের পর দিন বেল্লাল মাদ্রাসায় কোরান যায় পড়িয়া

একদিন এমন সুরে সে আজান দিন মদিনাবাসিকে পাগল করিয়া দিল

তার সুরে আল্লা আরস থাকিয়া গেল খুশী হইয়া,

তাই তো মদিনার আজান সে দিনেদিনে দিতে লাগিল

এদিকে আল্লার নিলা খেলা কে বুঝতে পারে

তার প্রিয় বান্দাকে যায় কঠিন পরীক্ষা করিয়া

জেব্রেয়াইকে পাঠায় আল্লা একখানা চিটি দিয়া

তাতে লেখা ছিল সাতদিনের হায়াদ হইল বেল্লালের

তাই তো সেদিন বেল্লালের লাগিয়া ওমর, পাত্রী যায় খুঁজিয়া

কিন্তু কেবা দিবে ৭ দিনের হায়াদের পুরুষকে কন্যা

শেষ পর্যন্ত ওমর এক কাঠুরিয়ার কাছে যায় চলিয়া

কাঠুরিয়া সব কথা শুনিয়া মাথায় পড়িল হাত গিয়া

মোর কন্যাকে দরিয়ার পানিতে কেমনে দেই ভাসাইয়া

তার কন্যা রাবেয়া চুপি থাকিয়া সবেই শুনিল গিয়া

সে বেল্লালের সনে বিয়াতে রাজি হইয়া যায়

তাই তো সেদিন নবীর তরিকায় হয় তাদের বিয়া খানা

এবার রাবেয়া যায় সুন্দর করি মহাব্বতের সহিত স্বামীকে সেবা করিয়া

এদিক মধ্যে ওজকরনি রাস্তা দিয়া মাকে সঙ্গে নিয়া যাচ্ছিল

হঠাৎ করিয়া মায়ের যায় খিদা পাইয়া, তাই সেদিন তারা বেল্লালের বাড়ি চলিয়া

ওজকরনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে মোর মায়ের লাগিয়া একমুষ্টি খাবার হইবে আজিকা

এই কথা শুনিরা রাবেয়ার মাথায় যায় হাত পড়িয়া

ঘরেতে মাত্র দুইখান রুটি আছে পড়িয়া

তাই তো স্বামীর কাছে যায় অনমুতির লাইগা

স্বামী ভাগের রুটি পাগলের মায়ের হাতে দিল তুলিয়া

পাগল খুশী হইয়া যায় দোয়া করিয়া

এদিক মধ্যে আজরাইল আসিল চলিয়া, বেল্লালের জান কবজ করিবার লাগিয়া

রাবেয়া যায় কান্না করিয়া, পাগল তার কান্না করার কারন যায় জিজ্ঞাস করিয়া

পাগলকে রাবেয়া বগলে বসিয়া দুঃখের কথা দেয় শুরু করিয়া

তাই তো পাগল আজরাইল কে তারাইয়া দিয়া

আল্লার আছে যায় বেল্লালের হায়াত ফরিয়াত করিয়া।

আল্লা আরস থাকিয়া পাগলের কবুল করিল

বেল্লালের হায়াত ৭০ বছর বারাইয়া দিল

তাই তো বেল্লাল- রাবেয়া দিনে দিনে আল্লার নামাজ পড়িতে লাগিল।

(সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, দিনহাটা (নয়ার হাট), তারিখ-১৩ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪. ২০ মিনিট)

মনছুর হাল্লাত

মনছুর ও আয়না ছিল যে জগতের বড় দুঃখী দুইজনা

ধীরে ধীরে মনছুর বৈণ আয়নাকে যায় বড় করিয়া

অভাব দূর করিবার লাগিয়া একদিন বড় পীর আব্দুল কাদের জেলানির কাছে যাচ্ছে

হঠাৎ করিয়া সেদিন আসিল বন্যা চলিয়া

বন্যার পানিতে যায় তারা ভাসিয়া

এমন সময় একজন কাজী আসিয়া তাদের বাঁচাইয়া তুলিল

একে একে তাদের পরিচয় যায় শুনিয়া

কাজী সঙ্গে তাদের বাড়িতে নিয়া যায় চলিয়া

দাসীবিত্তের কাজে লাগাইয়া দেয় তাদের

সেই না কাজির এক মেয়ে সন্তান হইল গিয়া

আয়না তাকে দেখা শুনা করিতে লাগিল

দিনে দিনে যখন সবুরা যায় মানুষ হইয়া

মাদ্রাসায় যায় সবুরা কোরান সিকিবার লাগিয়া

বই খাতা উবার লাগিয়া আয়না নিত্য তার সঙ্গে যায় চলিয়া

সেদিন আয়না কান্দে কান্দে জারে জারে আল্লার লাগিয়া

আজি মা বাপ থাকিলে মোকেও এমন করিয়া কোরান শিখাইল হয়

তাই সেদিন চুপি চুপি আয়না যায় কোরান শিকিয়া

বাড়িতে আসিয়া আয়না মনছুরকে দেয় কোরান শিখাইয়া

এদিক মধ্যে কাজী যায় একেএকে চক্রান্ত করিয়া

কাজী, আয়না মনছুরকে দিল আলাদা বাড়ি করিয়া

যাতে সমাজে তাদের ওঠে কলঙ্ক রটিয়া

আয়নার কোরান পড়া শুনিয়া বড় পীর যায় দারাইয়া

ঘরে আসিয়া মাও বুলিয়া ডাক দেয়, দরজা খান খোলেক আজিকা

আয়নাকে বড় পীর নিয়া গেল কোরানের তর্জমা শিখিবার লাগিয়া

সেখানে গিয়া আয়না দেখে আরও এগারো জন পীর আছে বসিয়া

আয়নাকে তারা মাঝখানে বসাইয়া কোরানের তর্জমা যায় শিখাইয়া

এদিক মধ্যে মনছুর বৈণের পিছু পিছু গেল চলিয়া

সবে যে লুকাইয়া দেখিল সেদিন মনছুর উপস্থিত থাকিরা

বৈণের সম্পর্কে তার ভুল ধারানা ভাঙ্গিল

আয়লার তর্জমা যখন শেখা স্যাস হয় গিয়া

তখন পীররা আয়নাকে আল্লার কাছে দোয়া করিতে যায় বলিয়া

আরস থাকিয়া আল্লা খুশী হইয়া সুগন্দ ফল দেয় পাঠাইয়া

আয়না সেই ফলখানা তেরো টুকরা করিয়া দেয় ভাগ করিয়া

একখানা ফলের টুকরা নিল যে ভাইয়ের লাগিয়া

বাড়িতে আসিলে ফল খানা যখন রাখিয়া আয়না নামাজ পড়িয়া

মনছুর না কয়া, নিয়ম না জানিয়া, সেই ফলখানা যে দেয় মুখে তুলিয়া

তখনই সে আয়লাল হক, আয়লাল হক বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল

চারপাশের মানুষগুলাকে তার যন্তু জানয়ার মনে হল

একমাত্র তার বৈণকে পবিত্র মনে হল

একদিক মধ্যে কাজী বেটা ছুটিয়া আসিল

আলনাল হক শুনিয়া কাজী মৌলানাদের তর্জমা করিতে বলিল

মৌলানারা বলিল এত যে নিজেকে আল্লা বলছে

কিন্তু মনছুর বলল আয়না যার লাগিয়া নামাজ পরে সেই না হকের কথা বলছি

কাজী তো আর মনছুরের কথা বুঝিল না

তাই কাজী একে একে মনছুরের গায়ে মারে চাবুক দিয়া

তবুও না ভোলে মনছুর আয়নাল হকের কথা

এরপর তার সরিল সাতখান টুকরা করিয়া আগুনে দেয় ফেলাইয়া

ছাই থাকিয়া আয়নাল হক নাম মানুষ শুনিতে লাগিল বারে বারে

মনছুরের সরিলের পোরানো ছাই গুলা একটা হারির মধ্যে বন্দ করিয়া দিল

আল্লা মনছুরের এত কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বন্যা দিল পাঠাইয়া

বন্যার পানিরে ছাই ভরা হারি কাজির কাছে যায় চলিয়া

কাজী হারি খুলিয়া দেখে একটা গোলাপ ফুল আছে হাজির হইয়া

সেই ফুল খানা যখন বাড়িতে নিয়া গেল, সবুয়া তখন না জানিয়া ঘ্রান নিল

আল্লার নিলা কে বুঝিতে পারে, সবুরা স্বামী ছাড়া হইয়া গেল গর্ভবতী

এই খবর জানা-জানির ভয়ে কাজী তাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিল

দশ মাস দশ দিন যখন পূর্ণ হইয়া গেল সবুরার গর্ভের বেদনা শুরু হইয়া গেল

সেদিন পূর্ণিমার চাঁদের মতো একখানা সন্তান গেল হইয়া

সবার চোখের আড়ালে কাজী বাচ্চাটাকে মাটির হাড়িতে দিল ভাসাইয়া

ভাস্তে ভাস্তে সেদিন মনছুর যায় যে জঙ্গলে চলিয়া

আল্লার গাইবি আওয়াজ যায় মনছুর পাইয়া,

তাই তো সেদিন মনছুর পান করিল বাঘের দুগ্ধ

বাঘিনি নিজের সন্তান মনে করিয়া নিল গেল বাসায় চলিয়া

এইভাবে জঙ্গলে যায় মনছুর বড় হইয়া

একদিন বাঘিনি কান্দিয়া কান্দিয়া তাকে আগের জীবন যায় বলিয়া

সে যে ছিল এক জাদুকরী, বাঘের জাদু দেখাইতে নিজেই বাঘ হইয়া গিয়াছিল

একখানা মন্ত্র দিয়া বাঘিনি তাকে ছাড়িয়া যায় রে চলিয়া

ওমর স্বপ্ন পাইল মনছুর যে জঙ্গলে আছে পড়িয়া

তাই তো সে ছুটিয়া আসিল, মনছুরের সরিল দিল পরিষ্কার করিয়া

নাবি কাটিয়া গাছে মারিল ডিল, সেখান থাকিয়া হইল আলব নতার গাছ হইল

আল্লার ইচ্ছায় মনছুর সবুরার দেখা পাইল

আল্লার জেব্রাইল বলে দিল মনছুর এই যে তোর জননী

অন্যদিকে সবুরাও একই খবর গেল পাইয়া

একে অপরের গলা ধরিয়া কাদিতে লাগিল।

মা সন্তানের মিলন গেল হইয়া

মনছুর ধনের মালিক না হইয়া জ্ঞানের মালিক হইয়া গেল।

(সাক্ষাৎকার, আমিনুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, দিনহাটা (নয়ার হাট), তারিখ-১২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৫.০০ মিনিট)

আইবনবী

এক যে ছিল ধনী বাতসা, আইব নবী তার নাম

দিনে রাইতে আল্লার এবাদক করছে মন দিয়া

নবী মোর তিন খানা বিয়া করিছে, আরও একখানা যে বাকি আছে

বাতসাহি করিতে গিয়া রহিমাকে বিয়া যে করিয়া আনিল

শয়তান সুখের সংসার দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল

আল্লাকে কয়, তোমার বান্দা আছে সুখে তাই তো করে তোমার এবাদত খানা

আল্লা শুনিয়া যায় যে খেপিয়া, শয়তানকে দিল বর ধালিয়া

আর আইব নবিকে দিল শাপ, দিল আটারোটা গজব

শয়তান আসিয়া একে একে সেই গজব গুলা দিল শুরু করিল

প্রথমে তার শত ইস্টিমার দিল দরিয়ার দিল ডুবাইয়া

আইব নবী শুনিয়া কয় আল্লার মাল গেইছে মুই তাতে কি করং

প্রথম গজব দিয়া শয়তান গেল ব্যর্থ হইয়া

দ্বিতীয় গজবের লাগিয়া করিল আয়োজন

যত না তার জায়গা জমি ছিল সবেই করিল মরুভূমি

তবু না আল্লার নাম না আইব নবী ভুলছে গেল

তৃতীয় গজবে তার বাড়ি ঘর গেল পুড়িয়া

গাছ তলায় হয়্যা গেল নবীজির ঠাই পাইয়া

সেইনা গাছ তলায় সে বিবি, বাচ্ছা নিয়া করে আল্লারও জব

তার ছিল এগারোটা সুন্দর নুরের মতো সন্তান

শয়তানের চোখ পড়িল সেই না সন্তানের দিকে

যেদিন তারা গেল মাদ্রাসা পড়িতে,

চড়কের গজব দিয়া এগারোটা সন্তানকে মারিল

আইব নবী শুনিয়া বলিল আল হামদু ইল্লা,

আল্লার জান আল্লা গেইছে নিয়া

সেই না সন্তানকে নিয়া মা জননী জারে জারে

চতুর্থ গজব দিল আইব নবীর গায়ে ফসা ধরা ঘাউয়া

একটা ফোঁসা আউলায় তা আর একটা হয়,

তিন বিবি পালাইয়া, রহিমা ছাড়িয়া না যায়

স্বামী লইয়া দেখ বিবি যায় না যায় চলিয়া

আইওব নবীর সনে করেছে প্রেম বিবি রহিমা

মাগো সকল বিবি চলিয়া যাবে তবু মা রহিমা স্বামী ছাড়িবেন না,

প্রানের বিবি রহিমা দিনে রাইতে যায় সেবা করি

পাড়ার মানুষ শুনিয়া কয় কুষ্ট রুগীকে এক্ষণে থাকিতে দিব নাই

তাই তো উপায় না পাইয়া আইব নবী রহিমাকে সঙ্গে নিয়া জঙ্গলে যায় চলিয়া

প্রথমে গেল শিমলা গাচে, সেই না গাছ দিল না ঠাই

রহিমা বিবি ছিল সতী নারী গাছকে দিল অভিশাপ

গাচেরও উঠিয়া গেল কাঠা

দ্বিতীয় বারে গেল জিগার গাচে, সেই না গাচ দিল দূর দূর করিছে হায়

রহিমা কান্দিয়া কান্দিয়া দিল শাপ, গাচ থেকে পড়িল আঁটা

তৃতীয় বারে গেল সুরমা গাচে, সেই না গাছ দিল বাঁধা

মাজী দুঃখ করিয়া সেই গাচকে দিল শাল, বলিল বাবা

সবার ফল পাইবে ছায়া, তোর ফল কোনোদিনেও পাইবে না ছায়া

তাই সেদিন লেবু গাছ দিল ঠাই, রহিমা বিবি তাকে দিল আশীর্বাদ

যখনয়ে কিছু দিন গেল চলিয়া, লেবু গাছের অধয্য ধরিয়া

কাঁটা দিয়া তাদের গুতা গুতি শুরু যায় করিইয়া

শেষ মেস জাইতন গাছ দিল তাদের ঠাই

গাচ তলায় পাইলেক ঠাই , খানা পানি নাই ছিল সঙ্গে তাই

রহিমা বিবি খাবারের লাগিয়া মানুষের ঘরে ঘরে যায় চলিয়া

কেউ না সেদিন কাজে নিল না মা রহিমাকে, দূর দূর করিয়া দিল তাড়াইয়া

এক ধনী শয়তান রহিমার রূপ দেখিয়া যায় ভুলিয়া

কাজ দিবার লাগিয়া রহিমাকে নিয়া যায় বাড়িতে চলিয়া

শত দুষ্ট কথায় রহিমা যখন না যায় রাজি হইয়া

রহিমার এক গাচি মাথার চুলের লাগিয়া খানা দিবে যায় বলিয়া

সেদিন স্বামীকে বাঁচানোর লাগিয়া চুল দিল বাতসার হাতে তুলিয়া

সেই না খবর খানা তারাতারি করি শয়তান আসিয়া আইব নবিকে দিল

শয়তানের কথায় আইব বিশ্বাস না করিল

বিবি যখন আসিল সঙ্গে খানা নিয়া

আইব নবী যায় জিজ্ঞাস করি

বিবি মোর তোর চুলের গোছা খানা দেখিতে চাই একবার

তাই না দেখিয়া আইব নবী বিবিকে যায় তালাক দিয়া

প্রানের স্বামী মোর মুই চলি গেইলে

কায় তোমাক করিবে এমন সেবা

এই ভাবতেও যায় আটারও গজব যায় পূর্ণ হইয়া

আঠারো বছর জঙ্গলে তাই যায় কষ্ট করি

শত কাষ্টে সেদিন আইব নবী না ভুলিল আল্লার নাম

আল্লা এবার শয়তানকে আদেশ যায় করি

মোর বান্দাকে গজব দেও বন্দ করি

একে একে আল্লা ধন সম্পত্তি পুত্র সন্তান সবেই দিল ফিরিরা

আর রহিমার মতো সতী আর এ জগতে হইল না রে ভাই ।

(সাক্ষাৎকার, কপির হোসেন, স্থান-কোচবিহার, দিনহাটা, গোবরাছড়া

তারিখ-১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪.২৭ মিনিট)

জাবেরের দাওয়াত

তিন দিনের অনাহারে হাসান-হোসেন দুটি ভাই রইছে পরিয়া

তাই জগৎ মা ফাতেমার কাছে গিয়া করছে কান্না-কাটি গিয়া

মাও মোর খানা দেও তারাতারি, ভোগের জ্বালা যে আর সহ্য হচ্ছে না মাগো

সেদিন মা-ছওয়া মিলে করছে কান্না, আলী গেইছে বাজার এলাও আইসে নাই

মা উপায় না পাইয়া সন্তান দুটিকে খেলা করতে বলে জাইয়া

তোমাদের আব্বা আসিবে এক্ষণে চলিয়া

ভাল ভাল বাজার থাকিয়া খানা আনিবে কিনিয়া

এই বলে ফাতেমা হাসান-হোসেনকে দেয় সান্তনা দিয়া

এদিক মধ্যে দিনের নবী সাতদিনের অনাহারে বাড়িতে রয়েছে পরিয়া

মনে মনে চিন্তা করে ধনী মে কুলসুমের বাড়ি যাইব চলিয়া

এই ভাবিয়া যখন দিনেরও নবী রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যায়

আল্লার নিলা কায় বুঝিতে পারে

সেদিন রাস্তা ভুল করিয়া কুলসুমের বাড়ি না গিয়া ফাতেমার বাড়ি যায় চলিয়া

হাসান হোসেন নানাকে দেখিয়া খুশী হয় জাইয়া

দিনের নবীর পকেটে হাত দেয় হাসান হোসেন গিয়া

নানা, আমারা দুটি ভাই যে তিন থাকিয়া অনাহারে আছি পড়িয়া

দয়া নানা খূড়মা খেজুর দেও আনিয়া

নবী কান্দে জারে জারে হয় ওরে মোর ভাই
মুই যে সাতদিন ধরে না খায়া আছোং রে
ভাই তোমরা কর খেলা, মুই খেজুর নিয়া এলায় আইসং চলিয়া
তাই সেদিন খেলা করিতে করিতে দুই ভাই যায় খালে পরি
দুই ভাইয়ে কান্না করছে ভাই ভাইয়ের লাগি করছে
হাসান হোসেনের কান্দন শুনি গাছের কাগও কান্দিছে জারে জারে

তাই দুই ভাই মিলে কাগাকে বলছে আর কান্দিতেছে

ওকি কাগা রে দিও খবর মোর জননীকে

যখন মাও মোর খড়ি কাটে রে

তখন না দিস খবর কুড়ালের বাড়ি পড়িবে পাওতে রে

যখন মাও মোর গোসল করে রে

তখন না দিশ খবর রে, মাও যে দরিয়ায় পড়িয়া যাইবে রে

যখন মাও মোর বিছানায় ঘুমায় রে

তখন না দিশ খবর রে

মাও মোর কাঁদিবে বালিস বুকে দিয়া রে

ওকি কাগা রে আর হবে না দেখা রে জননীর সাথে।

এই ভাবরে জেব্রাইল আসিয়া দিল ফাতেমা দিল খবর,

মা জননী কান্দিয়া কান্দিয়া সোনার ছওয়ার কাছে গেল

সেদিন হাসান হোসেনের লাগিয়া দয়ার নবী খুরমা খেজুরের সন্দান করিয়া যায়

ঘুরিতে ঘুরিতে এক খেজুর বাগান যায় পাইয়া

দুটি খেজুর যায় পাইয়া, কিন্তু দিনের নবী হয়া কেমন নিবে অনুমতি ছাড়া

দিনের নবী যায় মালিকের খোঁজ করি

বহু চেষ্টা করিয়া পাইল সেই বাদসার বাড়ি

বাড়িতে গিয়া নবীজি সালাম যায় দিয়া

সেই বাড়িতে ছিল এক বুড়ি সেই সালামের জবাব দেয় ফিরাইয়া

বাড়ির ভিতরে গিয়া মালিকের দেখা করে গিয়া

নবীজি মালিকে যখন সালাম জানায় মালিক তখন ধনের অহংকার দেখায়

ধীরে ধীরে নবী মোর দুটি খেজুরের কথা জানায়

সেদিন মালিকের মাথায় যায় হাত পরি

এ কোন ভাল মাইনসের দেখা পাইলাম রে

কত শত খেজুর থাকে গাছ তলায় পড়িয়া

দুটি খেজুর নিবার লাগিয়া আসিছে চলিয়া

মনে মনে ভাবে আর কয়, বিনা মূল্যে যে খেজুর দিব নাই

খেজুর পেতে গেলে ৩৬০টি গাছে পানি ডালিতে হবে যে

নবীজি যায় চিন্তায় পরি আল্লা একি তোমার নিলা খেলা বুঝিতে না পারি

তাই সেদিন দিনের নবী হাতে বালতি ঘারে রসি নিয়া খেজুর বাগানে যায় চলিয়া

একে একে ৩০০ গাছে দিল পাণি ঢালিয়া, হঠাৎ করিয়া যায় বালতির রসি ছিঁড়িয়া

বাতসা যখন এই খবর খানা পাইল, নবীজি কে আসিয়া চর মারিল

সেদিন নবীজি কান্দিতে কান্দিতে হাঁটিয়া যাচ্ছে চলিয়া

হঠাৎ করিয়া জাবের সাথে দেখা যায় হইয়া

নবিজিকে দেখিয়া জাবের দিল সালাম জানাইয়া

নবীজি শত যন্ত্রণা দুঃখ নিয়া সেদিন হাসি মুখে যায় সালাম ফিরিয়া

জাবেরের বাড়িতে নবী চলিল হাসান-হোসেনের খানার লাগিয়া

যখন খানা নিয়া ফিরিয়া আসিয়ে ছিল

তখন জাবেরের দুই সন্তান মারা যায় খেলা করিতে গিয়া

নবীজি ছুটিয়া আসিয়া সেই সন্তান দুটিকে বাঁচাইয়া তুলিল।

সেদিন আরও বাঁচিয়ে তুলল রান্না করা হাড্ডি থাকিয়া ছাগলকে।

এদিক মধ্যে সেই বাতসা নবীজীর চরের খবর যায় মাকে যায় বলিয়া

মাজি সেদিন কান্দে কান্দে জারে জারে ওরে বাবা মোর

তুই আজকা কাকে চর মারিছিচ রে, সে যে দিনের এ রসুল

এই কথা যখন বাতসা শুনিতে পাইল, তখন তার হাতখানা কাটিয়া ফেলিল

সারাটা দিন ধরে নবীজিকে খুঁজতে লাগিল

সারাদিন যখন খুঁজিয়া না পাইল, শেষে নদীর ঘাটে তার দেখা পাইল

নবীর কাছে সব কথায় যায় বাতসা বলিয়া

সেদিন নবীজি বাতসার কাঁটা হাত জোরাই করিয়া ।

(সাক্ষাৎকার, সফিকুল মিয়া, কোচবিহার, সিতাই, তারিখ- ২১ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩ টা ২০ মিনিট)

কুলছুমের মেহবানি

দিনের নবী সাতদিনের অনাহারে সত্তুর তালির জামা পড়িয়া

রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাচ্ছে বড় মেয়ে কুলসুমের বাড়ি চলিয়া।

মনে মনে চিন্তা করে ধনীমেয়ে কুলসুমের বাড়ি যাইয়া খানা পাইব গিয়া

এই ভাবিয়া যখন দিনেরও নবী রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যায়

সেদিন কুলসুমের বাড়ি না গিয়া ফাতেমার বাড়ি যায় চলিয়া

তিন দিনের অনাহারে হাসান-হোসেন দুটি ভাই রইছে

তাই জগৎ মা ফাতেমার কাছে গিয়া করছে কান্নাকাটি করছে গিয়া

মাও মোর খানা দেও তারাতারি, ভোগের জ্বালা যে আর সহ্য হচ্ছে না মাগো

সেদিন মা-ছওয়া মিলে করছে কান্না, আলী গেইছে বাজার এলাও আইসে নাই

এই দেখিয়া নবী মোর কান্নাকাটি করিয়া রাস্তা দিয়া যায় চলিয়া

বড় মেয়ে ছিল বরই ধনী সাত খানা গেট পার হইয়া বাড়িতে গেল পৌছিয়া

নবিজিকে পালঙ্গের বিছানা ছাড়িয়া কুলছুল মাটিতে দিল বসাইয়া

সেদিন গোস্ত মাছ বাদ দিয়া নবিজিকে দিল সুদায় ভাত বাড়িয়া

এতে আল্লা গেল অসন্তুষ্ট হইয়া,

তাই তো নবীজি খাইতে বসিলে আল্লা যায় বারন করিয়া।

নবীজি সেদিন কুলছুমের বাড়ি থাকিয়া রাস্তায় যায় চলিয়া

রাস্তায় যখন কুলছুমের স্বামী ওসমান গনির দেখা পাইল

নবীজি এবার সকল কথা খুলিয়া বলিল

ওসমান বলে, গনি এই গোনা দূর করিতে কি হইবে আব্বাজান আজিকা

নবীজি বলিলেন, সাত গ্রামের মানুষকে দাওয়াত দিয়া খাওয়াইতে হইবে

ওসমান গনি সাতদিন বাদে সাত গ্রামের মানুষকে দাওয়াত খাওরার করিল আয়োজন

কুলছুম সবাইকে দাওয়াত করিল শুধু হাসান-হোসেন,আলী-ফাতেমা না দিল দাওয়াত

আল্লা এই অহংকার নিল না মেনে, আরস থাকিয়া জেব্রাইলকে দিল পাঠে

যত সব রান্না করা ছিল খানা, সব গুলায় মাটি হইল গিয়া

বাড়িতে যত ধন সম্পত ছিল সবে ছাই দেখা গেল

আল্লার কি নিলা খেলা কে বুঝিতে পারে

সকাল বেলা ধনী, বিকাল বেলা হয়া যায় ফকির

যখন উপায় খুঁজিয়া না পাইল ওসমান গনি নবীজির কাছে চলিয়া গেল

নবীজি তখন সোন্দর করিয়া হাসান-হোসেন, ফাতেমাকে দাওয়াত দিতে বলিল

কুলছুল বিবি ধনীর অহংকার ত্যাগ করিয়া ফাতেমা বাড়ি গেল চলিয়া

আদর করিয়া কুলছুম হাসান-হোসেন, আলী-ফাতেমাকে নিয়া

নিজের বাড়িতে নিয়া আসিল সঙ্গে করিয়া

যখনে তারা কুলছুমের বাড়িতে আসিল চলিয়া

তারা যখন করিল দোয়া, দাওয়াতি লোক সবাই খাইল খানা

সবাই খানা হইল শুধু হাসান-হোসেন, আলী-ফাতেমা ছাড়া

হাসান হোসেন প্যাটের ভোগে কান্দে সেদিন

মা ফাতেমা সোন্দর বোঝাইয়া দেয়

হাশরের দিনে তোমরা খাইবে ওমরা দেখিবে

(সাক্ষাৎকার, মমিদুল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর-চামতা, তারিখ-২২ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০১ টা ২০ মিনিট)

আবুমুছা জঙ্গি

আবু মুছা জঙ্গি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যায়,

হঠাৎ করিয়া নামাজের সময় হয়া যায়

উজু করতে নদীতে নামলে আঙ্গুর ফল দেখিতে পায়

সেই ফল খানা তুলিয়া মুখে দেয়

ফল যখন খাওয়া শেষ হল তখন ইমানের কথা মনে পড়িল

তাই নামাজ শেষ চলিল ফলের মালিকের খোঁজে

যতয় যায় ততয় মানুষ কে জিজ্ঞাস করিয়া যায়

সামনে কিন আঙ্গুল ফলের বাগান আছে কিনা তাই

শেষে আল্লার দোয়ায় পেয়ে গেল আঙ্গুরের বাগান খানা

বাগানের মালিকের কাছে গিয়া সোন্দর করি ফল খাওয়ার কথা বলিল

সেদিন বাগানের মালিকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল

হায় রে , এত শত মানুষ কোথা থেকে আসিল আল্লা

তাই তো সেই বাতসা আবুকে বাড়িতে রাখিয়া দেয়

বারো বছর তাকে দিয়া খেজুর গাছে পানি ধালাইল তাই

দিনের পর দিন মাসের পর মাস আবু মুছা কষ্ট করিয়া যায়

সেইনা দেখিয়া বাতসা আনন্দ হয় যায় খুশী হইয়া

শেষে বাতসা নিজের মেয়ে হালিমার সঙ্গে আবুর বিয়ার কলমা দেয় পড়াইয়া

এই ভাবতে সুখের সংসার করে দুইজন মিলিয়া

এইখানতে মুছার স্ত্রী আল্লার দোয়ায় গর্ভবতী হইল সবাইকে জানাই,

একদিন এক ভণ্ড ফকির আবু মুছার বাড়ি আইসে ভিক্ষা করিবার লাগিয়া

মুছার বিবির রূপ দেখিয়া ফকির পাগলও হইল গিয়া,

ভিক্ষার পাত্র ফেলে দিয়া কু-প্রস্তাব দিল

মা জননী কাতর নয়নে আল্লাকে যায় ডাকিয়া

রক্ষা কর মাবুদ বিপদ কর পার

আল্লার কি খেলা কে বুঝিতে পারে

এরপরতে কি হইল গিয়া, বড় পীর পেট থাইকা বাইরে আসিল চলিয়া

সেদিন বাঘের রূপ ধরিয়া মায়ের সম্মান রক্ষা করে আসিয়া

মা জননী যখন কোরান পাঠ করে বড় পিরও তাই শেখে

এই ভাবতে যখন একদিন মায়ের আঙ্গুল ফল খাওয়ার শক হইল

গাছ তলায় তখন বিষাক্ত সাপ ছিল বসিয়া, তাই তো বড় পীর মায়ের লাথি মারিল

মা জননী গাছ তলায় না গিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়

দিনের দিনের পর যখন গত হইল বড় পীর তখন জন্ম গ্রহণ করিল

পাঁচ বছর যখন পূর্ণ হইল বড় পীর তখন মাদ্রাসাতে গেল

কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষা যে মায়ের পেটে শিখেছে

তাই তো সে চলল দূর দেশে উচ্চ শিক্ষার লাগিয়া

এ দিকে মায়ের মন সন্তানকে ছাড়া কেমনে থাকিবে

তার লাগিয়া মাও মোর বলিল বাবা তকে ছাড়া কেমনে থাকিব

আর যদি যাইবা চলে মোর মায়ের ঋণ সোত করিয়া যা

বড় পীর বলিতে লাগিল জননী,

তোমার দুধের ঋণ তো কবেই করেছি শোধ

মা শুনিয়া সেদিন যায় অবাক হইয়া

দুই দু বার রক্ষা করেছি যে তোমার জীবন মা জননী

একবার ফকির আর একবার বাঘের হাত থাকিয়া

এই ভাবতে মা জননী সন্তানের যায় প্রতিভা জানিয়া

বড় পীর বেড়িয়ে পড়লেন উচ্চ শিক্ষার লাগিয়া

এই পরে দিনে দিনে বহু বাতসাকে শিক্ষা ও মানুষ তাই

শেষে বাগদাতে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন আল্লার লাগিয়া।

(সাক্ষাৎকার, আহাম্মদ আলী, স্থান- কোচবিহার, সিতাই, বত্তর-চামতা, তারিখ-২৪ নভেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ৩. ২৩ মিনিট)

ইসমাইলের কোরবানি

এব্রাহিম ধনীর মেয়ে ছায়রা বানুকে বিয়া যায় করিয়া

এভাবেতে দুইটি বছর গত হইয়া গেল

একদিন স্বামীর কাছে ছায়রা বিবি যায় যে বলিয়া

স্বামী একখানা দাবী পুরন করিতে হবে তাই

এতদিন গেল তবু কেন সন্তান হইল না মোরে

তাই তো তোমার এবার করিতে হবে দ্বিতীয় বিয়া সন্তানের লাগিয়া

এব্রাহিম বলে বিবি সুখের সংসারে আজি দুঃখের আগুন জ্বালাবো নাই

ছায়রা কান্দিয়া কান্দিয়া বলিয়া যায় আপনি যাকে বিয়া করিবেন আনিয়া

ছোট বোনের মতো স্নেহ করবো যাইয়া

তবু স্বামী দ্বিতীয় বিয়া কর আনিয়া

এই কথা যখন ছায়রা বিবি বলিয়া যায়

এব্রাহিম তখন ইসলাম প্রচার করিতে যায়

ছায়রা বিবি ঘটক আনিল ডাকিয়া স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ার লাগিয়া

ঘটক এবার ঘুরিয়া বেরায় নানান দেশ এব্রাহিমের দ্বিতীয় বিয়ার লাহিয়া

ঘুরিতে ঘুরিতে একটা আল্লার এবাদত কারি সুন্দর নারী গেল যে পাইয়া

সেই না খবর খানা ঘটক আনিল ছায়রা বিবিকে দিল

এবার এব্রাহিম মুন্সি-মওলানা নিয়া হাজেরার বাড়ি গেল চলিয়া

আল্লার ফরজ কাম খানা আদায় নিল করাইয়া

হাজেরাকে যখন এব্রাহিম বিয়া করিয়া বাড়িতে আনিল

বিবি দিনের পর দিন সুন্দর করি যায় স্বামীর সেবা করিয়া

স্বামীর সর্ব অঙ্গ উজু দেয় করাইয়া

মাথার চুল দিয়া স্বামীর পাও দেয় মোছাইয়া

এই ভাবতে মাসের মাসের পর মাস যায় যে গত হইয়া

আর এই ভাবতে দুইটা বছর গেল গত হইয়া

এব্রাহিম দেখে হাজেরার সন্তান হয় না যাইয়া

সেদিন হাজেরা সতী কয় শোন শোন প্রানের স্বামী বলি যে আপনারে

হাজেরার কথায় এব্রাহিম যায় নামাজ পড়িয়া

আল্লাপাকে সন্তানের জন্য দোয়া যায় কবুল করিয়া

ঘরে যখন হাজেরা বিবি স্বামীর সঙ্গে পারছিল নিন

আকাশ থাকিয়া একটা যে তারা হাজেরার গর্ভে যায় প্রবেশ করিয়া যায়

হাজেরা বিবি নিন থাকিয়া উঠিয়া স্বামীর কাছে সব কথাই বলিতে লাগিল

শোন শোন প্রানের স্বামী বলি যে আপনারে

আকাশ থাকিয়া একখানা তারা যে তাই

আমার গর্ভে প্রবেশ করিল ভাই

স্বামী সেই কথা খানা মানুষকে বলিতে নিষেধ গেল করি

তাই তো সেদিন এব্রাহিম হাজেরা বিবি যায় মহব্বত করিয়া

এদিক মধ্যে ছায়রা বিবি গেল বোধ পাইয়া

দিনে রাইতে বুদ্ধি করে হাজেরাকে মারিবার লাগিয়া

এ যে সুখের ঘরে দুঃখের আগুন গেল জ্বলিয়া

তাই তো দিনে রাইতে ছায়রা যায় হাজেরাকে কষ্ট দিয়া

হাজেরা মুখ বন্ধ করিয়া ছায়রার যায় কষ্ট সহ্য করিয়া

মন কান্দে প্রানও কান্দে হাজেরার লাগিয়া

একে একে হাজেরা যায় সতীনের কষ্ট সহ্য করিয়া

সেদিন ছায়রা বিবি গিয়া হাজেরাকে বলিয়া যায়

শোন মোর প্রানের ছোট বোন তোমারে জানাই

দেও দেবতার বাতাস যে লাগিবে তোমার শরীরে

তাই তো তোমার দেহ খানা খুতনা করিয়া নেও আজিকা

সন্তান যে ভাল থাকিবে ইহার লাগিয়া

এদিক মধ্যে ছায়রা সতীনকে মারার লাগিয়া কি কাম করিল

কামারের বাড়ি থেকে বড় বড় বালি আনিল বানাইয়া

তায় দিয়া নাকে কানে দিল ফরাইয়া

দর দর করিয়া রক্ত পড়ছে ও প্রানের ভাই সেদিনকা

দিন খানা গত হইয়া মায়ের মুখখানা গেল ফুলিয়া

হাজেরাকে দেখিয়া যায় যে চেনা

ও হ দিদি মোর এই ছিল কপালে

আরে ও হ দিদি মোর এই ছিল কপালে......

এদিক মধ্যে স্বামী আসিল যে বাড়িতে চলিয়া

প্রাণ প্রিয় বিবি এমন অবস্থা দেখিয়া যায় যে কান্না করিয়া

স্বামীকে দেখিয়া হাজেরা বিবি চোখের পানি ছাড়িয়া কান্দিল তাই

সবে যে কথা গেল কান্দিয়া কান্দিয়া বলিয়া।

অন্যদিকে যখন ইব্রাহিম ছায়রা বিবির কাছে গেল

ছায়রা বিবি গেল নিজের মোহরানার দাবী করি...

ইহার লাগিয়া হাজেরাকে বনবাসে দিয়া আসো গিয়া

আর যে জায়গা খানতে দিবে বনবাস তাতে না থাকে যেন জীব যন্তুর বাস

এব্রাহিম শত চেষ্টায় সেই দাবী খানা বদলাতে না পারল

তাই তো অজর নয়নে কান্না কাটি যায় হাজেরার লাগিয়া

প্রাণের বিবিকে দিয়া আসিতে হবে বনবাসে

হাজেরার লাগিয়া ৪১ খাবা রুটি, এক নোটা পানি বসামির হাতে দেয় তুলিয়া

হাজেরা স্বামীকে কয় এই পানি রুটি কোথায় যাও লইয়া

এব্রাহিম একে একে সব কথাই গেল খুলিয়া বলিয়া

ও হ প্রানের স্বামী, স্বামী মোর এই ছিল কপালে

যাওয়ার সময় হাজেরা ছায়রার কাছে বিদায় নিল

আমি গর্ববতী নারী কোন দিন যাবো মরি

দোষ করলে নিজের বোন মনে মাপ দেবে করি

বাড়ি থেকে বহু দূরে মরুভূমির বালু চলে দিল নামাইয়া

বিবি আজ থেকে এই বালু চরে হবে তোমার সঙ্গের সাথী

কান্দিয়া কান্দিয়া উঠের পিঠে চরে বাড়ীতে আসিল ফিরিয়া

ছায়রা বিবি খিল খিল করিয়া হাসি দিয়া গেল

অন্যদিকে ৪১ দিন পরে মা হাজেরার পোষবের বেদনা গেল শুরু হইয়া

প্রসবের বেদনায় মাও মোর কান্দিছে জারে জারে ভাইয়া

আল্লার কাছে দুই হাত তুলে বলছে, গর্ভের সন্তানকে দেও পাঠাইয়া

না হয় প্রাণ পাখিকে নিয়া যাও চলিয়া

জারে কারে কান্দে আর কয় স্বামী মোর কোথায় গেইলেন চলিয়া

মরণের সময় দেও না একবার দেখা.........

আরে স্বামী আইস না চলিয়া, স্বামী মোর আইস না চলিয়া

রক্ষা কর মাবুদ বিপদ কর পার,

আল্লাপাক আরস থাকিয়া হাজেরার দোয়া গেল কবুল করিয়া

তাই তো পূর্ণিমার চাঁদের মতো একখানা নুরে আমিন সন্তান গেল হইয়া

মা সুন্দর করিয়া ছেলের মুখখানায় যায় চুমা করিয়া

আদর করিয়া নাম রাখিল ইসমাইল যাইয়া

এবার রাত্রি কাটিয়া সকাল গেল হইয়া

রসুনের চোঁচার মতো ছেলের মুখ গেল সুকিয়া হায় রে

মার বুকতে যে এক ফোটাও যে দুধও ছিল না হায় রে

মা ছুটিয়া বেরাইতে লাগিল এক ফোঁটা পানির লাগিয়া

চথুরদিকে খুজিয়া খুজিয়া যে এক ফোঁটা যে না পাইল পানি

শেষে উপায় না পাইয়া মা জননী নিজের জিহ্বা সন্তানের মুখে যে দিল লাগিয়া

কিন্তু মায়ের জিহবাতে যে এক ফোটাও ছিল না রস

তাই মা জননী জঙ্গলে থেকে বাইরে আসিল বেরিয়া

পাগলের মতো ঘুরিয়া বেরাইতে লাগিল পানির লাগিয়া

ও রে মাওয়ে জানে সন্তানের ব্যাথা রে ভাই

আল্লার কাছে জারে জারে কান্দে, আজি বুঝি মানিককে বাছাতে না পারিব রে

উত্তর দিকে পানি দেখিতে পায় এবার ইসমাইলকে বুঝাইয়া কয়

বাবা মোর ওই দেখা যায় পানি এলায় আনি তোক খোয়ং

কিন্তু কাছে যায়া দেখে পাহাড়ের সাদা পাথর টলমল করছে

এদিক মধ্যে ইসমাইল যখন মাটিতে পা আছরাইতে লাগিল

মাটি সেদিন সয্য করতে না পারিয়া আল্লার কাছে যায় ফরিয়াত করিয়া

আজকে তোমার বান্দা আমাকে লাথি মারছে সহ্য করতে পারছি না

তাই তো সেদিন ইসমাইলের বাম আঙ্গুলের আঘাতে গেল জমজম কুয়া হইয়া

হল হল করিয়া জমজম কুয়া থাকিয়া পানি যায় উঠিয়া

ইসমাইল যে একটা সাদা পাথরে সুখের ঘুম ঘুমাইতেছে

এই চুয়ার পানি খাইয়া ইসমাইল যায় বড় হইয়া

তাই তো সেদিন কান্না করে আল্লার কাছে এবাদত করে

আর আরস থাকি আল্লা মা হাজারার কান্দন সুনি

জিব্রাইলের হাতে পবিত্র খুরমা বিছ দেয় পাঠাইয়া

হাজেরার হাতে খুরমা বিছ জিব্রাইল গেল দিয়া

বিপদ করিবে তুমার পার খুরমা বিছ লাগাও এখন

আবে জমজম কুয়ার পাশে খেজুর গাছ দিনে দিনে বড় গেল হইয়া

হঠাৎ করিয়া একদিন কি হইল তাই একদল বনিক আসিল ভাই

সেদিন বনিকের দল মা মা করিয়া ডাকিছে কান্দিয়া কান্দিয়া

দয়া করিয়া মাগো মাও মোর এক গেলাস পাণি পান করাও আজি

মায়ের দাকে হাজরা সতী গেল পাগল হইয়া

সুন্দর করিয়া আবে জমজম কুয়ার পানি হাতে দেয় তুলিয়া দিল

সওদাগার দল পানি খাইয়া গেল পাগল হইয়া

পাণির লাগিয়া সওদাগর দল স্ত্রী সন্তান লইয়া সেখানে বাস করিল

এই ভাবতে যখন গেল কিছু দিন গত হইয়া

ইসমাইল গেল বড় হইয়া সবাই কে যাই কইয়া

সেদিন তার পাঁচ বছর বয়স হল সবার কাছে বলা হল

আর হাজেরা গেল চিন্তায় পরি ছেলের লেখা পড়া নিয়া তাই

এমন সময় মায়ের মনে বুদ্ধি আসিল ভাই

একটা মাদ্রাসা তৈরি করিল তাই ,

সওদাগারের ছেলে মেয়ের সঙ্গে লেখাপড়া করে ইসমাইল

যত ছাত্র ছিল মাদ্রাসাতে ভাই ইসমাইলের সঙ্গে লেখা পড়ায় না যে পায় তাই

তাই তো সেদিন সওদাগারের বাচ্ছারা পলছি করিয়া যায়

আমাদের সবার তো বাবা আছে তোমার বাবা যে দেখিতে না পারি ভাই

ও মা জননী মা গো বলি যে তোমারে

আর, শোনও শোনও মা জননী তোমার কাছে মা বলছি আমি

স্কুলের যত ছাত্র ছাত্রী তাই, বাবা কথা মাগো

জিজ্ঞাস করছে হায় , বলে মা কে বাবা আমার যাইয়া

ও মা জননী, মা গো বলি যে তোমারে

তাই সেদিন হাজরা সতী চোখের পানি ছাড়িয়া

অতি ইচ্ছেমাইকে কোলায় নিয়া সুন্দর করে কয় বুঝাইয়া

তোমার বাবা আছে আসবে কোনদিন চলি

আল্লার কি নিলা কে বুঝিতে পারে......

হঠাৎ করিয়া এব্রাহিমের মাথায় আসিল হাজেরার বিবির কথা ভাই

তাই তো সেদিন এব্রাহিমের হাজেরার কাছে ছুটিয়া আসিল

হাজেরা স্বামীকে দেখিতে পাইল ছুটিয়া আসিয়া সালাম যে করিল

দয়ার স্বামীকে করিতে লাগিল সুন্দর করিয়া সেবা

এব্রাহিমের তাতে গেল মুগ্ধ হইয়া

এবার স্বামীকে যখন ঘরে নিয়া গেল ইসমাইল গেল জিজ্ঞাস করিয়া

ইনি কেমা হন মামা জননী আমার

হাজেরা ছেলের লাগিয়া বলিয়া যায়, ইনি যে তোমার আব্বা হুজুর তাই

এসমাইল বলে এতদিন কেন আসেন না আব্বা হুজুর আমার

এব্রাহিম বলে সোনা ময়না মোর এ কথা তোমাকে পরে জানাবো

এব্রাহিম মনে মনে ভাবে এই খানতে যদি বেশিক্ষণ থাকি মহাব্বদ হইয়া যাবে

আর মহাব্বত হয়া গেলে যাইতে পারিবো না মাবুদ

তাই সেদিন এব্রাহিম হাজেরার কাছে বিদায় নিয়া চলিয়া যায়

ওরে এব্রাহিম যখন বাড়িতে গিয়া নামাজ পড়িতে লাগিল

আল্লার তরব থাকি গাইবি আওয়াজ আসিল

তোমার প্রিয় জিনিশকে কোরবানি দেও করিয়া

তাই তো সেদিন এব্রাহিম একে একে চারশো পশু গেল কোরবানি করিয়া

কিন্তু আল্লার মন তাতেও ভরিল না

এব্রাহিম গেল চিন্তায় পরি হঠাৎ করিয়া ইসমাইলের কথা গেল মনে পরি

এই ভাবিয়া যারে যারে কান্দে আর কয়

আল্লা বুঝি চাইছে মোর কলিজার টুকরা ইসমাইলের কোরবানি তাই

তাই তো সেদিন মিনা বাজারে গেল রহনা হইয়া

ইসমাইলকে সাজাইয়া গোছাইয়া নিল হাজারর কাছ থাকিয়া

এবার ইসলাম কে করবানির লাগি এব্রাহিম গেল রহনা হইয়া

উঠের পিঠে এব্রাহিম চলে যায় ভাই

এদিক মধ্যে শয়তান যায় চক্রান্ত করিয়া

মা হাজেরার গিয়া সব কথা বলে খুলিয়া

তোমার স্বামী যে আজি ইসমাইলকে দিবে ওই না কোরবানী

এই কথা শুনিয়া হাজেরা শয়তানকে দেয় দূর করিয়া

এর পর শয়তান ইসমাইলের যায় চলিয়া

শয়তান বলে তোমার বাবা আজি তোমাকে যে কোরবানি

এই কথা খানা যখন ইসমাইল শুনিল তখন

শইয়তানকে ঢিল মারিয়া তারিয়া দিল

বিবাহ নামে ময়দান ছিল একখানা

এসমাইকে এব্রাহিম গেল নিয়া সেখানে

ইসমাইল বলছে বাবাজান আর কতদূর যাইতে হবে

উঠ থাকি এব্রাহিম নামিয়া ইসমাইকে বলে যায়

তোমার সনে দুই চার কথা বলিব আজি তাই

এব্রাহিম বলে তোমার কাছে আজ একটা দাবী করিব

তাই সেদিন এব্রাহিম কান্দিতে কান্দিতে সব কথাই খুলিয়া বলিল

ইসমাইল শুনিয়া কয় বাবা আমার যে কোন আপত্তি নাই

ওরে মায় যেন না জানে বাবা মোরে করবানি দিচ্ছিস করাইয়া

ওরে নতুন জামা প্যান পরাইয়া দিয়েছে মাও মোর রে

ওরে সেই জামা কাপরে রক্তের দাগ না লাগে রে

আমার আব্বাজান ও মোর প্রানের বাবা জান

ওরে হাতো পাও দরি লাগাও খিছিয়া খিছিয়া

ওরে চোখ দুইখানা বন্ধ করো ঘারের গামছা দিয়া

ইব্রাহিম নিজের চোখ দুই খানা বন্ধ করিল ঘারের গামছা দিয়া

একে একে দুইবার সুরী চালায় ইব্রাহিম তাও না ছেলের গালা কাটিল।

ইসমাইল কয়, উল্টা পাশে না চালাও বাবা মোর ঘারে ছুরি।

ওরে এত জ্বালা এত কষ্ট বাবা না সয় আজি

ধার পাকে সুরী ফোছাও বাবা, দুনিয়া ছেড়ে যাব চলে।

এই ভাবিয়া ইব্রাহিম গেল চিন্তায় পড়িয়া,

এত ধারের ছুরি চলছে না খোদা আজি মোর ছেলের গলায়।

দ্বিতীয় বারের বেলা যখন আবার ছেলের গলায় দিল ফোজ,

তবুও ছেলের না গলা কাটিল। তখন

ইব্রাহিম ছুরি পাথরের উপর মারিল ডিল, সেই না পাথর সত্তুর টুকরা হইল গেল ।

ইব্রাহিম সেই না পাথরের টুকরো দেখিয়া আল্লা তোর নিলা খেলা বুঝিতে পারি না-

ইসমাইল বলে আর না করো দেরি

অতি তারাতারি দেও না গলায় সুরি

এই মায়ার সংসারে আর যে থাকতে চাই না

তৃতীয় বারের বেলা ছুরি চালাইল যখন

আল্লার জিব্রাইল আসিয়া হাজির হইল তখন

ইসমাইলকে সারাইয়া রাখিয়া দুম্বাকে রাখিল সুয়াইয়া

সেদিন ইসমাইল না হইয়া দুম্বা হইলেক কুরবানি।

ওরে মায় যেন না জানে বাবা মোরে করবানি দিচ্ছিস করাইয়া

ওরে নতুন জামা প্যান পরাইয়া দিয়েছে মাও মোর রে

ওরে সেই জামা কাপরে রক্তের দাগ না লাগে রে

আমার আব্বাজান ও মোর প্রানের বাবা জান

ওরে হাতো পাও দরি লাগাও খিছিয়া খিছিয়া

ওরে চোখ দুইখানা বন্ধ করো ঘারের গামছা দিয়া

ইব্রাহিম নিজের চোখ দুই খানা বন্ধ করিল ঘারের গামছা দিয়া

একে একে দুইবার সুরী চালায় ইব্রাহিম তাও না ছেলের গালা কাটিল।

ইসমাইল কয়, উল্টা পাশে না চালাও বাবা মোর ঘারে ছুরি।

ওরে এত জ্বালা এত কষ্ট বাবা না সয় আজি

ধার পাকে সুরী ফোছাও বাবা, দুনিয়া ছেড়ে যাব চলে।

ওরে কতই দুঃখ দিবি রে দয়াল

ওরে তুমি আর দুঃখ দিয়

ওরে আমার সইবার মতো জায়গা দিয়া

আমারে সাগরে ভাসাইও রে।

ইসমাইল বলে আর না করো দেরি

অতি তারাতারি দেও না গলায় সুরি

এই মায়ার সংসারে আর যে থাকতে চাই না

তৃতীয় বারের বেলা ছুরি চালাইল যখন

আল্লার জিব্রাইল আসিয়া হাজির হইল তখন

ইসমাইলকে সারাইয়া রাখিয়া দুম্বাকে রাখিল সুয়াইয়া

সেদিন ইসমাইল না হইয়া দুম্বা হইলেক কুরবানি

(সাক্ষাৎকার, আয়নাল মিয়া, স্থান- কোচবিহার, ভেটাগুড়ি, তারিখ-১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়- বিকাল ০৪.৩০ মিনিট)

আয়নাল মিয়া স্থান-কোচবিহার ভেটাগুড়ি তারিখ- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮

মমিদুল মিয়া স্থান- সিতাই, কোচবিহার ২০ নভেম্বর ২০১৮ রাত্রি ৮ টা ৩০ মিঃ

আহাম্মদ আলী স্থান- সিতাই, কোচবিহার ২০ নভেম্বর ২০১৮ রাত্রি ১০ টা ৩০ মিঃ

সফিকুল মিয়া স্থান- সিতাই, কোচবিহার ২১ নভেম্বর ২০১৮ রাত্রি ৯ টা ৩০ মিঃ

কপির হোসেন স্থান-গোবড়াছড়া, কোচবিহার ১০ ই নভেম্বর ২০১৮ বিকাল ৪ টা ৩০ মিঃ

আমিনুল মিয়া স্থান- নয়ারহাট, কোচবিহার ১৩ নভেম্বর ২০১৮ রাত্রি ৯ টা ৩০ মিঃ

কোচবিহার হরিন চওড়া মহরমের উৎসব ২১ শে জুন ২০১৮ সময়
বিকাল- ৪ টা

কোচবিহার হরিন চওড়া মহরমের উৎসব ২২ শে জুন ২০১৮
সময়- সকাল ১০ টা

কোচবিহার হরিনচওড়া পীর উৎসব ২১ শে জুন ২০১৮ সময়- বিকাল ৩ টা

কোচবিহার চিলকির হাট, পীর উৎসব ৯ ই বৈশাখ ১৪২৫ সময়- রাত্রি ৭ টা

কোচবিহার চিলকির হাট, পীর উৎসব ৯ ই বৈশাখ ১৪২৫ সময়- রাত্রি ৭ টা

কোচবিহার সাহেবগঞ্জ, আমিনা বিবি ও সাব্বুদ্দিন সেখ ১৭ ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়- দুপুর ২ টা